অমর মিত্র

নরেন হরেন যাদু মানুষ

অমর মিত্র

নরেন হরেন ঘাস মানুষ

নরেন হরেন

সাধু মানুষ

নরেন হরেন

সাধু মানুষ

অমর মিত্র

আ ত্ম জা

Naren Haren Sadhu Manush
A Short Story Collection by Amar Mitra
Published by ATMAJAA PUBLISHERS
ওয়েব : www.atmajaa.com
ইমেইল :contact@atmajaa.com

ISBN : 978-93-87885-16-5

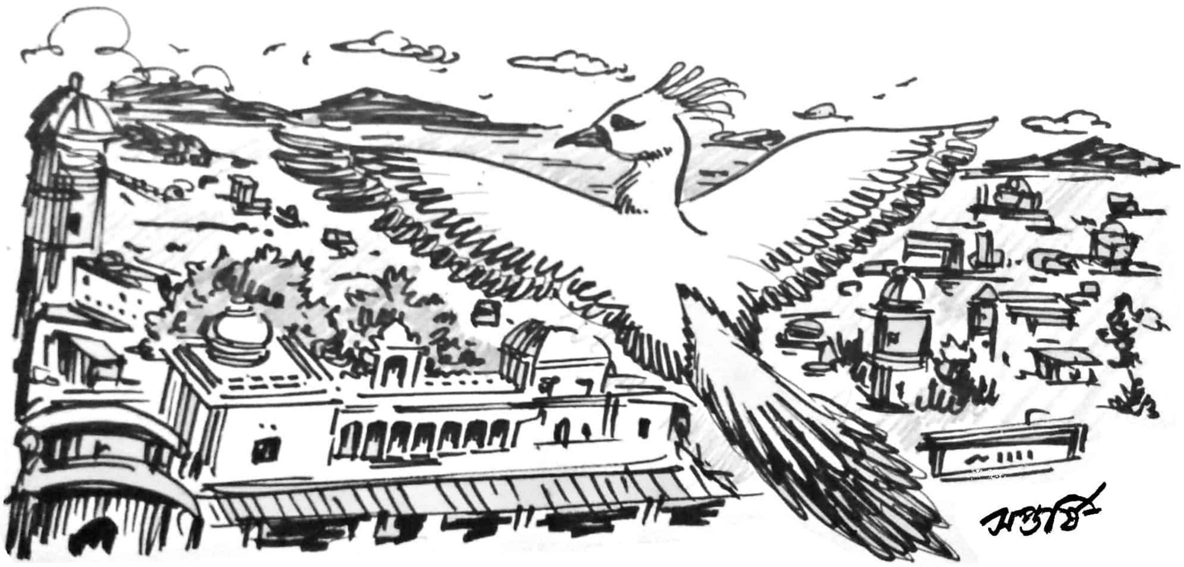
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৪২৫
ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু
অলঙ্করণ : সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী।
প্রকাশক
অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়
আত্মজা পাবলিশার্স
বসন্ত কুসুম, আড়িয়াদহ, কোলকাতা -৫৭
মুদ্রণ।
সত্যযুগ এমপ্লয়িস কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩ এবং ১৩/১এ, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কোলকাতা – ৭০০০৭২

পরম স্নেহের

মেহুল ও
তনভী
দুই বোন’কে

বিন্যাস

রাজার বাড়ি



পাখিটা উড়তে উড়তে এল রাজার বাড়ি। নীল রঙের লেজ, হলুদ রঙের পিঠ, লাল রঙের পেট আর আর মাথাটি হলুদ পালকে ভর্তি। পাখির নাম, রঙভরা। নামটি রাজার বাড়ি থেকে পাওয়া। সে হলো খবরিয়া পঙ্খী।খবর নিয়ে আসে রাজার বাড়ি। সে উড়তে পারে অনেক উঁচু দিয়ে। ফলে পাহাড়তলীর মানুষ তাকে তীর দিয়ে ছুঁতে পারে না।বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ করতে পারে না। তার চোখের খুব জোর। কত উঁচু থেকে সে সব দেখতে পায়। কী দেখতে পায়, না গারো রাজার দেশে হচ্ছে কী। অত্যাচারী সেনাবাহিনী আসছে কি আসছে না, খারাপ মানুষ ভালো মানুষের উপর অত্যাচার করছে কি করছে না, সিমসাং নদীতে বান এল কি এল না, নদীর ভিতরে হয়েছে নৌকো ডুবি হলো কি হলো না, এই সব খবর নিয়ে খবরিয়া পাখি উড়ে আসে পাহাড়ে। এই সিমসাং নদীর রাজার রাজধানীতে যেমন কিছু হয় না প্রায়, রাজার বাড়িতে রাজা আর রানি থাকেন,আর কেউ না। না মন্ত্রী, না কোটাল কিংবা সেনাপতি। রাজা রানি দুজনেই বুড়ো। হাজার বারোশো বয়স হয়েছে। রাজা আর রানি কথা বলে আর নিজ মনে মাথা নাড়ে। রাজার রাজ্য নিয়ে নিয়েছে সোমেশ্বর পাঠক নামে আর এক রাজা। রাজা ছিল না সে। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিল এদিকে বাণিজ্য করতে। তারপর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ যে হবে তা রাজার বাড়ির কেউ জানত না। রাজা না, সেনাপতি না। যুদ্ধ হয়নি কোনো কালেই। কে আসবে যুদ্ধ করতে? যুদ্ধ মানে হিংসা। হিংসা মানে রক্তপাত, মৃত্যু। তাতে খুব ভয় গারো রাজার, তাই যুদ্ধ হয়নি। আর সোমেশ্বর পাঠক বিনা যুদ্ধে রাজ্য জয় করে পাহাড়তলীতে রাজধানী নির্মাণ করল। কত দিনের কথা তা! কিন্তু গারো রাজা আছেন। তাঁকে ছুঁতে পারেনি সোমেশ্বর পাঠক। যে কিনা পরে হয় সোমেশ্বর সিংহ। রাজা হয় সিংহ। বনের রাজা সিংহ, তাই দেশের রাজাও সিংহ। কী হয়েছিল সেই সময়? সিমসাং নদীর দেশের রাজা বলেন, কিছুই হয়নি, সোমেশ্বর পাঠক আসতেই পারেনি রাজার বাড়ি দখল করতে। এলে ভয়ানক কিছু হতো। রাজার বাড়িতে আগুন লাগত। রক্তপাত হতো। তখনও এক পাখি এসে খবর দিয়েছিল। রংভরা খবরিয়া পাখি। আসছে। রাজা মশায় তারা আসছে দামামা বাজিয়ে। যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ! নাকে তেল দিয়ে ১৮ ঘন্টা ঘুমোনো সেনাপতি পালিয়ে বনে চলে গেল।

মন্ত্রী আর দেওয়ান মনে মনে ভেবে নিল ভিনদেশিরা এলেই তাদের দলে চলে যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। রাজা এসে দাঁড়ালেন বনের ধারে খোলা আকাশের নিচে। যুদ্ধের ভেরি বাজাতে বাজাতে আসছে ভিনদেশিরা। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন আয়। এল। কে এল? যোদ্ধারা না হস্তিযূথ? হস্তিযূথকে দিয়ে প্রতিরোধ করলে ভিনদেশিরা মরত সব। কিন্তু হস্তিযূথ প্রস্তুত নেই বলেছিল সেনাপতি। বলে বনপথ দিয়ে সোমেশ্বর পাঠকের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। রাজা কিছুই না করে কুয়াশা ডাকলেন। কুয়াশা নেমে এল আচমকা। আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল যেন। কুয়াশায় ছেয়ে গেল বন-পাহাড়। কুয়াশার দেওয়াল উঠে গেল রাজবাড়ির সব দিকে। সোমেশ্বর পাঠকের সৈন্য আর ভেরিবাদকরা কুয়াশায় পথ হারিয়ে সাতদিন ঘুরেছিল পাহাড়ে আর বনে। তারপর নামতে পেরেছিল নিচে। আর সেনাপতি পথ হারিয়ে এখনো বনে ঘুরছে। মন্ত্রী আর চিনতেই পারেনি রাজার বাড়ি। ব্রহ্ম দেশের পথে চলে গিয়েছিল শোনা যায়। মানে রংভরা পাখির খবর তেমন। রাজার বাড়ি তাই রাজা একা। মন্ত্রী নেই, সেনাপতি নেই। রানি আর রাজা আছে আর আছে হস্তিসেনা। আর আছে রংভরা খবরিয়া, লাল নীল হলদে সবুজ মোহন পাখি।

মোহনরে মোহন, কী খবর?

মোহন পঙ্খী খবর দেয়, সেই কতদূর থেকে মিলিটারি আসছে ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক, রাইফেল নিয়ে পাহাড়তলীর রাজার দেশে।

পাহাড়তলীর রাজা সোমেশ্বরের কোনো রাজ্য নেই, আমার রাজ্য সে নিয়েছে,আমি দিয়েছি তাই নিয়েছে, প্রজারা সব আমার। সিমসাং নদীর রাজা বলল।

কেউ বাঁচবে না কামানের হাত থেকে, পাকিস্তানি সেনা নেমেছে যুদ্ধ করতে, যুদ্ধে কোনো বিপক্ষ নেই, আছে প্রজারা, তাদের কোনো বন্দুক নেই, তারা চাষবাস করে খায়। রংভরা পাখি বলল।

যা বলেছিল রংভরা খবরিয়া সব সত্যি। সেই যে অনেক বছর আগে সে দেশে মুক্তিযুদ্ধ লাগে।পাকিস্তানি মিলিটারির কামান বন্দুকের বিরুদ্ধে দা কুড়ুল নিয়ে যুদ্ধে নামে সে দেশের মানুষ। সেই তখনকার কথা হচ্ছিল রাজা আর খবরিয়ার। রাজা বলল, আমার প্রজা, রক্ষা করব আমি।

পাহাড়তলীতে পাকিস্তানি সেনা আসতে না আসতে কুয়াশা নামল দশদিক জুড়ে। আর সেই কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল হাতির পাল। পাকিস্তানিরা পালিয়েছিল। পালাতে গিয়ে নদীর জলে ডুবে মরেছিল। হাতির পায়ের তলায় পিষে মরেছিল।

সে কতকাল আগের কথা। তারপরও কত খবর এসেছে। রাজা শুনেছে আর চুপ করে থেকেছে।বন্যায় ফসল নষ্ট, চাষীদের খুব কষ্ট। রাজা বললেন, পরের সনে বানা হবে না, চাষ হবে ভালো, আমার প্রজাদের কষ্ট হবে না।

কত খবর আসে।একটা শয়তান লোক দলবল নিয়ে খুব ঝামেলা করছে। চাষীদের ঘরে আগুন দিচ্ছে,চাষীদের ফসল লুট করছে।রাজা হাতি পাঠালেন। অন্ধকার রাতে হাতি নেমে গিয়ে লোকটাকে শুঁড়ে করে তুলে এনে বনের ভিতরে ছেড়ে দিল, কুয়াশায় ঘিরে দিল তার চারদিক। সেই কুয়াশা থেকে লোকটা বেরতে পারেনি। খারাপ লোককে কুয়াশার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে শাস্তি। রাজার বাড়ি অভিযান করতে এসে ফিরে গেছে ব্রহ্মদেশের রাজা। কুয়াশায় দিকভ্রান্ত হয়েছিল তারা। তো এতদিন বাদে রংভরা খবরিয়া খবর আনল একটা লোক আসছে। সে দেখেছে একটা লোক আসছে। রাজার বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে একটা লোক আসছে। কেমন মানুষ সে?

খবরিয়া বলল, এমনি মানুষ।

এমনি মানুষ! রাজার বাড়ি আসছে কেন?

রংভরা খবরিয়া বলল, এমনি আসছে।

এমনি মানে কী? সিমসাং রানি জিজ্ঞেস করল।

এমনি মানে এমনি, লোকটা আসছে রাজার বাড়ি দেখতে।

রাজা বলল, গারো পাহাড়ে রাজার বাড়ি আছে তা কে বলল?
শুনেছে সে। পঙ্খী বলল।
কে শুনালো? রাজা জিজ্ঞেস করল।
কেউ না রাজামশায়, এমনি শুনেছে।
এমনি শুনা যায়? রানি জিজ্ঞেস করল।
যায় মশায় যায়, না গেলে সে আসে কী করে?
তার হাতে অস্ত্র আছে? রাজা জিজ্ঞেস করে।
না মশায়, সে শান্ত মানুষ।
শান্ত মানুষ এতদূর আসে কেন?
খবরিয়া পঙ্খী বলল,এমনি আসে মহারাজ, কুয়াশা হয় না যেন মশায়।
মশায় মহারাজ বলল, রাজার বাড়ির পথ কেউ জানবে না, কুয়াশা হবে তবুও সে আসবে এখানে, আসুক সে, কিন্তু এসে করবে কী?
রাজা রানি আর রাজবাড়ি দেখবে। খবরিয়া পঙ্খী বলল।
দেখে করবে কী? রানি জিজ্ঞেস করল।
এমনি দেখবে মশায়া। খবরিয়া পঙ্খী বলল।
এমনি এমনি আর এমনি, এমনির বাইরে হয় না কিছু? রাজা অধৈর্য হয়ে বলল।
সে জানে মশায়, সে এক ভালোমানুষ। খবরিয়া বলল।
ভালোমানুষ তো আসা কেন?
পাখি শিস দিয়ে উঠল, পাখি গান গেয়ে উঠল,
সিমসাং নদী, তুমার রাজায় কত না কথা কয়।
সিমসাং নদী আজও দেখি এমনি এমনি বয়।।
এমনি আলো এমনি কুয়া, এমনি মানুষ ভালো।
এমনি জগত এমনি পাহাড় এমনি এত আলো।।
রাজা বলল,আমার প্রাসাদে ভালোমানুষ আসবে,তাকে কী দিয়ে আপ্যায়ণ করব?
রানি বলল, আমাদের খেজুর রস আর পিঠাপুলি, আর হরিণের দুধ।
তারে আমরা কী দেব, কোন মণি রত্ন? রাজা জিজ্ঞেস করল।
রানি বলল, বাঁশের ঝুড় আর বেতের ধামাভরা আপেল আর কমলা লেবু সবুজ লেবু দেব।
মোহন পঙ্খী খবরিয়া বলল,তাহলে আমি দেখে আসি, কেমনে সে আসে, ঠিক পথে আসে না ভুল পথে যায়?
যাওরে মোহন পঙ্খী খবরিয়া,
আসো তারে নিয়া।
কুয়াশায় কুয়াশা নামে
আসে কোন পথ দিয়া।।

***

লোকটা পাহাড়ের পথে কিছুটা চলে আচমকা দেখল কুয়াশা নেমে এল। দুর্ভেদ্য কুয়াশা। এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। কিন্তু সে জানত এমনি হবে। কুয়াশার ভিতরেই আত্মরক্ষা করে সিমসাং রাজা। কুয়াশার প্রাচীরের ভিতরই রয়েছে রাজার বাড়ি। রাজা রানি। সে অন্ধের মতো চলতে লাগল। গারো পাহাড়ে এক রাজার প্রাসাদ আছে, রাজা রানি আছে, সে তাদের দেখতে এসেছে। দেখে ফিরে যাবে, আর কিছু না। মানুষ এমনি কত কিছু দেখে ফিরে যায়, সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পাহাড়, জঙ্গল, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, কত কিছু। এমনিই

দেখে ফিরে যায়। সেও এমনি দেখে ফিরে যাবে কি যাবে না, তা পরের সিদ্ধান্ত। আর কিছু না। এই যে এত কুয়াশা, এমনি কুয়াশা এল কোথা থেকে, সে শুনেছিল, কুয়াশা পেরিয়ে যেতে হবে রাজার বাড়ি। কত পথ যেতে হবে, কত দূর তা জানে না লোকটি। সে নিজের মতোই চলছিল। ভুল না ঠিক পথ জানে না। কিন্তু যেতে যেতে তার মনে হলো কুয়াশার ভিতরে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে। সে ডাক দিল, কেউ আছ, আমি রাজার বাড়ি যাব, কোন পথে যাব?

মোহন পাখি খবরিয়া ছিল এক শাল গাছের ডালে,বলল, যে পথে যাও, রাজার বাড়ি পৌঁছবে।

কোন পথে তাড়াতাড়ি পৌঁছব?

মোহন পাখি খবরিয়া বলল, যে পথে যাও, একই দূর।

রাজার বাড়ি উত্তরে না দক্ষিণে, পুবে না পশ্চিমে?

উত্তর দিক দিয়ে যাওয়া যায়, পুব দিক দিয়েও যেতে পার, পশ্চিমে রাজার বাড়ি আবার দক্ষিণেও সেই একই বাড়ি, সিমসাং রাজা আর সিমসাং রানি তোমার জন্য বসে আছে ধামা ভরা ফল-পাকুড় আর গজা কদমা নিয়ে। পঙ্খী বলল।

লোকটা নিশ্চিন্ত হয়। এমনিই শুনেছিল বটে। সে জিজ্ঞেস করল, আর কত সময় লাগবে?

মোহন পঙ্খী বলল,সময় কী তা তো জানি না, তুমি ঠিক পৌঁছে যাবে।

লোকটি অনেক লম্বা, স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ, সে চলল কুয়াশার ভিতরে। চলতে চলতে চলতে, আচমকা দেখল কুয়াশা নেই। বিকেলের আলো যেন মুছে যেতে যেতেও রয়ে গেছে। রোদ নেই। আলোর ভিতরে সূর্যাস্তের লালচে ভাব। কুয়াশার দরজা ভেদ করে লোকটা পৌঁছে গেল। রাজা রানির ঘরে তাঁরা আছেন। অতিথির জন্য একটি আসন। আসনের সামনে পানীয় জল, মিষ্টান্ন। রাজা তাকিয়ে আছেন অতিথির মুখের দিকে। অতিথিও রাজার দিকে চেয়ে আছেন।

রাজা বিস্মিত গলায় বললেন, তুমি?

হ্যাঁ আমি। লোকটি বলল।

তুমি কি এই প্রাসাদ অধিকার করবে? রাজা অকম্পিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটা মাথা নিচু করল, বলল, আমি সব ফেরত দিতে এসেছি রাজা।

তুমি সোমেশ্বর পাঠক!

হ্যাঁ মশায়, রাজা।

রানি জিজ্ঞেস করলেন, কী ফেরত দেবে?

যে রাজ্য জয় করেছিলাম, সেই রাজ্য। বলে দীর্ঘদেহী সেই রাজপুরুষ দুহাত বাড়িয়ে দিলেন।

রাজা বললেন, আমাকে কোন রাজ্য ফেরত দেবে, রাজ্য তো আমার আছে।

আছে! বিস্মিত হলেন রাজা সোমেশ্বর পাঠক।

আছে, আমার রাজ্য তো আমারই আছে, কিছুই তুমি নিতে পারো নি।

সোমেশ্বর পাঠকের চোখে জল এসে গেল, বললেন, তাই বলছ রাজা?

হ্যাঁ, আমার কিছুই যায়নি রাজা, তুমি কী দেবে?

সোমেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন গারো রাজার দিকে। গারো রাজা, সিমসাং নদীর রাজা উঠে এগিয়ে এলেন। আলিঙ্গন করলেন তাঁরা পরস্পরে। আর তখনই অন্ধকার নেমে এল। সূর্যাস্ত হলো। প্রাসাদ আর রাজা রানি সব মুছে গেল জগত থেকে। দেখল সব সেই খবরিয়া পাখি। লাল নীল হলুদ সবুজ মোহন পঙ্খী খবরিয়া। সে উড়ে গেল এই কাহিনি নিয়ে। রাজার বাড়ি নেই। দুই রাজা আর নেই। কুয়াশা আর নেই। তার কাছেই সবটা আমার শোনা।

ভুবনের রাগ গগনের হাসি



ভুবন মণ্ডল যাচ্ছিল মুকুন্দপুর। সে কত দূর? অনেক দূর। অনেক মানে? হেঁটেই যাবে শুধু, পৌঁছবে না। বাসে গেলেও এমন জায়গায় নামিয়ে দেবে, হাঁটতেই হবে। ট্রেনে গেলেও তাই। স্টেশন থেকে হাঁটন। ভুবন মণ্ডল সেই মুকুন্দপুর যাচ্ছিল। কেন যাচ্ছিল, না তার দরকার ছিল। কী দরকার? না, দরকার ছিল, সব কথা সকলকে বলা যায় না। মুকুন্দপুর যাচ্ছিল, এমনিই হয়তো যাচ্ছিল। এমনি কি কোথাও কেউ যায় না? সকলেই কি কাজের বিবরণ বুক পকেটে নিয়ে হাঁটে। ভুবন যাচ্ছিল এমনি। এমনি নাকি সে যায়। কেন যায়, ইচ্ছে হলেই সে মুকুন্দপুর যায়। বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে, কিংবা ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে...। মুকুন্দপুর যেতে হলে এই হাঁটন হাঁটতেই হবে। বিকল্প নেই। রিকশা কিংবা অটো বা টোটোর টিকিটি দেখা যাবে না। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হলেই মুকুন্দপুর। সেই মুকুন্দপুরে যেতে গিয়ে বা যাওয়ার পথে আজ

ভুবনের বিপত্তি হয়েছে। সবদিন সে একা একা যায় মুকুন্দপুর,একা একা ফেরে চৈতন্যপুর, কিন্তু আজ সে একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে বাস থেকে নামতেই।বাসের নাম পঞ্চানন। পঞ্চানন বাস সার্ভিস। সেই বাস আসে হাসিমপুর থেকে,যায় কাশিমপুর।এই দুয়ের মধ্যখানে চৈতন্যপুর। ঠিক চৈতন্যপুরও নয়। জায়গাটার নাম বটতলা। বটতলা আর রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে চৈতন্যপুর। বাস দেখতে পেয়ে ছুটে এসেও ধরা যায় না। বাসের টাইম মনে রেখে বেরোতে হয়। চৈতন্যপুর বটতলায় বাস স্টপেজ। সেখানে উঠে মুকুন্দপুর চাঁপাতলায় নামতে হয়। আসলে জায়গাটা চাঁপাতলাই। যেমন আগের জায়গাটা বটতলা। মুকুন্দপুর অনেক দূর চাঁপাতলা থেকে।এই পথটা একা যেতে হয়, কিন্তু সেদিন, মানে সেই বুধবারে চাঁপাতলায় কেউ তার জন্য অপেক্ষা করছিল। লম্বা মানুষ, ঝোলা গোঁফ, ধুতি আর শার্ট পরা, পায়ে পামশু। মাথায় পাকা চুল আর কাঁচা চুল। বাস থেকে নেমেই লোকটাকে দেখতে পেয়েছিল সে। হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে ভুবনকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাস কি লেট করল?

ভুবন চমকে গেল, বলল, না তো।

আপনি তাহলে লেট করেছেন? লোকটা বলেছিল।

না তো, আমি লেট করলে বাস মিস করতাম তো।

লোকটা বলল, ঠায় দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ, ছায়া ছোট হয়ে গেছে।

ছায়া ছোট হয়ে গেছে মানে লোকটা সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। সূর্য যত উপরে ওঠে, ছায়া ততো ছোট হয়। ভুবন তা জানে। তার ইস্কুলের মাষ্টার অঘোরবাবু বলেছিল। সে তখন কান ধরে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে। বেলা বারোটার পর নাকি ছায়া আবার বড় হবে। ভুবনের সব মনে আছে। সে বলল, ছায়ায় আমার কী যায় আসে, আমি কি ছায়া ধরতে এসেছি?

লোকটা বলল, আমি মুকুন্দপুর যাব।

ভুবন জিজ্ঞেস করে, কী নাম?

আঁজ্ঞে, অনেকগুলো নাম আছে, কোনটা শুনতি চান?

ভুবন বলল, কোনটা আমি জানব কী করে?

লোকটা বলল, আমিই বা বলব কী করে?

ভুবন রেগে যেতে যেতে রাগ সামলে নিল। রেগে যাওয়া ভুবনের স্বভাব। এই জন্য অনেক ডাক্তার বদ্যি করেছে, তাদের ওষুধ গিলেছে, কিন্তু রাগ পড়েনি। তখন একজন, কে তা বলব না, এক ভবঘুরের সঙ্গে দেখা তার বটতলার হাটে। সে জড়বটি বেচছিল আর বড় বড় কথা বলছিল। লোকটা কেমন যেন অদ্ভুত। অদ্ভুত কেন, না বুকের উপর পোস্টার ঝুলিয়ে বলছিল, কোনো সমস্যা নাই, আমার কাছে আসুন। পোস্টারে শুধু রঙ ছিল, লাল নীল, হলদে, সবুজ...। অনেক লোক অনেক সমস্যা নিয়ে যাচ্ছিল, কারোর দাঁতে ব্যথা, কারোর পায়ে ব্যথা, কারোর মাথা ব্যথা, কারোর গলায় ব্যথা, কারোর ছেলে পালিয়েছে,কারোর শুধু ঘুম পায়,কেউ আবার ঘুমায় না। তো ভুবন গিয়েছিল তার কাছে, তার কথা শুনে ভুবনের খুব রাগ হয়েছিল। গিয়ে বলেছিল,এই লোকটা তোমার নাম কী,এত যে বড় বড় কথা বলো।

সে বলল, আমার নাম ভুলে গেছি।

ভুবন চিৎকার করে বলেছিল,বুঝেছি,তোমার নাম ভুলো রায়, তাই তো।

লোকটা বলল, বলব না।

বলতে তোমার হবে,নইলে খুব খারাপ হবে। ভুবন খুব রেগে বলেছিল।

লোকটা বলেছিল, বুঝেছি বুঝেছি, তুমি মুকুন্দপুর চলে যাও।

ভুবন বলেছিল, কেন?

লোকটা হেসে বলেছিল,উপকার পাবে,রাগ কমবে, মাসে অন্তত তিনদিন যাবে, বেশি হলে ক্ষতি নেই।

ভুলো রায়ের কথায় তার মুকুন্দপুর আসা মাসে তিনবার, চারবার, পাঁচবার। থাকে না, ফিরে যায় লাস্ট বাসে। সারাদিনে বাস আসুক না আসুক ফার্স্ট বাস আর লাস্ট বাস আসবেই। আর তা দেরি করেই আসবে, সন্ধে হয়ে গেলে, আকাশে তারা ফুটে গেলে, চাঁদের দিন থাকলে চাঁদ উঠলে, চাঁদের দিন না হলে চাঁদের বদলে অন্ধকার ফুটলে। টর্চ হাতে ভুবন দাঁড়িয়ে থাকে ফেরার জন্য। একা একা।সে একা চাঁপাতলায় নামে, একা ফিরে যায়। আর কাউকে কোনোদিন নামতে দেখেনি হেথায়। ফেরার সময় উঠতেও দ্যাখেনি এখান থেকে। আজই একটা লোককে দেখল। সেই লোকটার নাকি অনেক নাম, কোন নামটা বলবে তা জিজ্ঞেস করছে। ভুবন বলল, নামটা বলো তুমি, আমাকে চিনলে কী করে?

সে হেসে বলল, চিনি না তো।

তবে যে হেসে এগিয়ে এলে? ভুবন অবাক। রাগ হচ্ছিল, তবু সামলে নিল আবার, বলল, অচেনা লোকের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইনে।

আমি মুকুন্দপুর যাব। লোকটা বলল, চল তোমার সঙ্গে যাই।

ভুবন রেগে গিয়ে বলল, আমি মুকুন্দপুর যাব কে বলল?

আমি জানি। লোকটা হেসে বলল।

জানলে কী করে? ভুবন ভ্রু কুঁচকে সন্দেহভরা গলায় জিজ্ঞেস করে।

লোকটা বলল, ভুলো রায় বলেছে।

ভুলো রায় মানে সেই ব্যথা নিরাময়ের হাটুরে লোকটা? ভুবন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তার সঙ্গে কোথায় দেখা হলো?

আঁজ্ঞে ছোটনদীর পারে হলদিডাঙায়। হেসে বলল সেই লোক।

সে আবার কোথায়, জানিনে তো। বিরক্ত হয়ে ভুবন বলল।

ছোটনদী জানেন না? লোকটা জিজ্ঞেস করল।

না জানিনে, সব কিছু জানতে হবে নাকি? মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে ভুবন।

হলদিডাঙাও না? লোকটা নরম গলায় জিজ্ঞেস করে।

তুমি কি চৈতন্যপুর চেন? খুব রেগে গিয়ে ভুবন জিজ্ঞেস করে।

আঁজ্ঞে না, কিন্তু চিনব আমি, খুব শিগগির চৈতন্যপুর যাব। লোকটা বিনীত স্বরে বলল।

তোমাকে নিয়ে যাবে কে? ভুবন রেগে জিজ্ঞেস করে।

আঁজ্ঞে, আপনার সঙ্গে যাব।

ভুবন বলল, তুমি কে হে, যে তোমাকে চৈতন্যপুর নিয়ে যেতে হবে?

লোকটা বলল, আচ্ছা সে কথা পরে হবে।

তুমি এখানে কেন বলো দেখি? ভুবন জিজ্ঞেস করে।

আঁজ্ঞে তিনি আমাকে মাসে তিনদিন অন্তত মুকুন্দপুর আসতে বলেছেন, তাহলে আমার উপকার হবে।

এতক্ষণে সবটা খোলসা হয়ে গেল। কিন্তু এও কি রেগে যাওয়া মানুষ? কী সব্বোনাশ। তাহলে তো দুজনের ভিতরে মারামারি লেগে যাবে। আবার রাগ হয়ে গেল ভুবনের। ইস, ভুলো রায় কি আর কোনো গ্রাম চেনে না? মুকুন্দপুরেই পাঠাতে হবে সকলকে? এই লোকটাকে নিয়ে সে মুকুন্দপুর যাবে না। কিছুতেই না। বসে থাকবে চাঁপাতলায়। ছায়া ছোট হতে হতে আবার বড় হয়ে যাবে। বড় হতে হতে ছায়া ছড়িয়ে যাবে দিগন্তে। অন্ধকার হবে। শেষ বাস এলে সে ফিরে যাবে চৈতন্যপুর ভায়া বটতলা।

লোকটা হেসে বলল,যাবেন না, কেন যাবেন না, মুকুন্দপুর যেতেই তো এসেছেন।

ভুবন রেগে যায়, আমি কোথায় যেতে কোথায় এসেছি তা আমি বুঝব, তুমি বলার কে ?

লোকটা হাত জোড় করল, আঁজ্ঞে ভুলো রায় বলেছে আপনাকে নিয়েই মুকুন্দপুর যেতে।

আমি ওসব জানিনে,যাব না তো যাব না। অনেকদিন বাদে রাগ করতে পেরে ভুবনের খুব আরাম হচ্ছিল। মুকুন্দপুর যায় আর আসে। মুকুন্দপুর একটা নিঝুম গ্রাম। লোকজন বিশেষ নেই। একটা হোটেল আছে। সেখানে ভাত ডাল বেগুনভাজা, আলু পোস্ত ঝিঙে পোস্ত আর কাঁটাওয়ালা বাটা মাছের ঝোল পাওয়া যায়। চাটনি দিত না। সে একদিন খুব রাগ করতে চাটনি দিতে আরম্ভ করেছে। গরমে আমের। শীতে টোম্যাটোর। খুব গরমে তেঁতুলের চাটনিও করে। ভাত খেয়ে হোটেলের লম্বা বেঞ্চে শুয়ে একটা ঘুম মারে ভুবন। তারপর যায় মাঠের ধারে। চুপচাপ বসে থাকে আমতলায়।কেউ তাকে কিছু বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করে না। মুকুন্দপুর এক অদ্ভুত গ্রাম। লোকজন উঁচু গলায় কথা বলে না।ঝগড়া করে না।হোটেলে অনেক লোক খেতে আসে। কারোর গলা শোনা যায় না। মুকুন্দপুরের রাস্তায় কুটোটি পড়ে নেই। গাছে গাছে কত রঙের ফুল। কেউ ফুল ছেড়ে না। কিন্তু ইদানীং ভুবনের খুব অসুবিধে হচ্ছিল। সারাদিন চুপচাপ। কেন বসে গল্প তো করা যায়। তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে তো, তার নাম কী, বাড়ি কোথায়, কেন আসে এখেনে? কিন্তু কেউ তা জিজ্ঞেস করে না। অচেনা কারোর সঙ্গে দেখা হলে হাসি মুখে তাকে সম্বোধন করে, ভালো আছেন তো? আরে তুমি আমাকে চেন যে ঐসব জিজ্ঞেস করো? ভালো আছি না মন্দ আছি তোমাকে বলব কেন?

হ্যাঁ, সে ভালো আছে কি খারাপ আছে তা জেনে ওর কী হবে? তবু তাকে বলতেই হয়, হ্যাঁ, ভালো আছি। আবার বলেও না কখনো। মুখ গম্ভীর করে চলে যায় তাকে এড়িয়ে।এতদিন আসছে, তবু কারো সঙ্গে বন্ধুতা হয়নি ভুবনের। বন্ধুতা চায়ও না ভুবন। বন্ধু তার কম ছিল না চৈতন্যপুর আর তার আশেপাশে অনেক বন্ধু। কিন্তু তার স্বভাবের জন্য বন্ধুরা সরে গেছে। রাগ তার খুব। ছোটবেলায় কতজনের মুখ ফাটিয়েছে রাগে। মারও খেয়েছে। এখন মনে হয় অত রাগ না থাকলে হতো। আবার এও মনে হয়, রাগ ছিল বলেই লোকে তাকে ভয় করত। তার বাড়িতে চোর-ডাকাত পড়ত না। একবার একটা লোক তাদের বাগানে আম চুরি করতে এসে আমের থলে সমেত ধরা পড়ে যায়। তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে জল বিচুটি লাগাবে যখন, ভুবনের বুড়ি মা এসে আটকায়। আরে দুটো আম বই তো নয়। খুলে দে বাঁধন। যাও বাবা, আম নিয়ে যাও। এরপরে যখন আসবে আমাকে বলে নেবে যা দরকার হয়, আম, জাম, লিচু, পেয়ারা...। উফ, সেই চোর এরপর তার সামনে থেকেই থলে ভর্তি লিচু নিয়ে বেরিয়ে যেত, শুধু বলত, মা ঠাকরুন, লিচু নেব?

মা বারান্দায় বসে বলত,নাও বাবা নাও,ভগবান দিয়েছেন, তুমি নেবে।

উফ, কী রাগ হতো তখন, কিন্তু কিছু করার ছিল না। চোর এসে ফল-ফলারি এমন কি কাঁসার বাসন নিয়ে যাবে, চোখে দেখেও রাগ সামলে থাকতে হবে।

লোকটা বলল, চলুন, মুকুন্দপুর চলুন।

তুমি যাও, আমি পরের বাসে ফিরে যাব।

লোকটা হেসে বলল, এতদূর এসে ফিরে যাবেন?

যাব আমার ইচ্ছে। ভুবন গরগর করে বলল।

লোকটা বলল, আহা রাগ করছেন কেন, আমাকে তিনি পাঠালেন তাই আমি এলাম, না হলে আমি কি আসতাম।

তোমার নাম বললে না। ভুবন বলে।

বলছি, কিন্তু কোন নামটা বলি?

আবার সেই কথা,তোমায় লোকে কী বলে ডাকে? ভুবন জিজ্ঞেস করে।

লোকটা বলল, নানা মানুষ নানা নামে ডাকে?

সে আবার কী কথা?রেগে গেল ভুবন।তাকে কি গাধা ভেবেছে লোকটা?

হ্যাঁ,কেউ যদি ধরেন ভুবন নামে ডাকে আর একজন গগন নামে ডাকে, কেউ যদি গগন ডাকে তো আর একজন ডাকে স্বপন, স্বপন যদি কেউ ডাকে তো অন্য একজন ডাকে জুড়ান, জুড়ান ডাকে একজন তো আর একজন...।

ভুবন মণ্ডল হাত তোলে, হয়েছে হয়েছে হয়েছে, আর বলতে হবে না, উফ, আমার নামটাও আছে দেখি তোমার, ভুবন।

না আঁজ্ঞে, নেই, কিন্তু লোকে ডাকে, লোকে ডাকে যদি আমি কী করব, চলুন মুকুন্দপুর যাই, আজ ইলিশ মাছ আর খিচুড়ি হবে, দুপুরে বর্ষা হবে কি না।

ভুবন মণ্ডল বলল, হ্যাঁ, গগন কে বলল দুপুরে বৃষ্টি হবে?

লোকটা বলল, গগন আমার নাম না, কিন্তু কেউ কেউ ডাকে, যেমন আপনি ডাকলেন।

তুমিই বলো তাহলে তোমার নাম। ভুবন রেগে গিয়ে বলল।

লোকটা হেসে বলল, যার যেমন ইচ্ছে ডাকে, আমিও সাড়া দিই, আপনার যেমন মনে হয় ডাকুন।

এইবার ভুবন হেসে ফেলে। কেন হাসে? না রাস্তার ওপার দিয়ে এক ধোপা গাধার পিঠে জামা কাপড়ের পোটলা চাপিয়ে হাঁটছিল। ভুবনের মনে হলো লোকটাকে গাধা বলে ডাকে। ডাকলে কি সাড়া দেবে? না ডেকেও ভুবন হাসল। উফ, এতক্ষণে একটু হাসি এল। এই মুকুন্দপুরে এসে যে তার রাগ পড়বে, তা হয়নি। উলটে মুকুন্দপুরের লোকের হরেক রকম কথা শুনে সে মনে মনে রেগেছে কতবার! ফুলে হাত দেবে না, জিলিপি খেয়ে রাস্তায় শালপাতা ফেলবে না, জোরে কথা বলবে না...। আমি যা করব সব তোমার আদেশে করব? আমার ভালো লাগলে আমি গাছে ফোঁটা ফুল ছিড়বই। গম্ভীর হয়েই থেকেছে সে এতদিনে। আজ এই লোকটা, যার নাম ভুবন, গগন, স্বপন বা জুড়ান হতে পারে, তার আর একটা নাম গাধা ভেবেই...। খুকখুক করে হাসছে ভুবন। তখন লোকটা বলল, চলুন, অমনি হাসির কত কিছু আছে জগতে, রাগ করার চেয়ে আনন্দ করারই বেশি, হাসির ঘটনা বেশি, চলুন মুকুন্দপুর যাই।

সত্যি আছে হাসির? ভুবন জিজ্ঞেস করে।

আছে ভুবনদাদা,এই যে মেঘ করছে আকাশে, দেখলে ভালো লাগে কি না বলুন।

ভুবন মণ্ডল বলল, হলদিডাঙায় এমন মেঘ হয়?

কত হয়, রোদ চমকালেই মেঘ এসে ঢেকে দেয়, মুকুন্দপুরেও তাই, আপনার চৈতন্যপুরেও।

ভুবন বলল, খেয়াল করিনি, আরে ওই দ্যাখো, তালগাছের মতো ওই একটা লোক আসছে, মাথায় কত চুল।

হুঁ, গগন কিংবা জুড়ান বলল, দেখুন দেখুন লোকটা হাসছে আমাদের দেখে, আমাদের দিকেই আসছে, কেন আসছে?

ভুবন মণ্ডল বলল, হ্যাঁ, কেন আসছে বলো দেখি? তারপর হেসে বলল, দ্যাখো কত লম্বা, লোকটার মাথায় একটা টিয়া এসে বসল, পাখিটা ভেবেছে একটা গাছ।

গাছই তো, মানুষ না গাছই মনে হয়। বলে হা হা করে হাসতে লাগল গগন কিংবা জুড়ান। তা দেখে ভুবন কি না হেসে পারে। মুকুন্দপুরের দিকে হাসতে হাসতে হাঁটতে লাগল। তাদের মাথায় ছায়া দিয়ে দিয়ে মেঘ চলতে লাগল। বড়ই হাসির ব্যাপার। আনন্দেরও। ভুবনের মনে হলো।

নরেন হরেন সাধু মানুষ



একটা ছিল লোক। ঢ্যাঙা মতো, রোগা মতো, কালো মতো, অনেক কিছুর মতো সেই লোকটার ছিল একটা জমি। জমির উপর একটা বাড়ি ছিল। হ্যাঁ, একটা ছিল বাড়ি। সেই বাড়িটার সামনে একটা বাগান। ফুল ছিল, ফল ছিল, আর ছিল একটা নিম গাছ। একটা ছিল নিম গাছ। তার ডালে ছিল আর কেউ। একজন নয় দুজন। তারা সন্ধে হলেই পা দুলোত। দুঃখী দুই ভবঘুরে। যখন বেঁচেছিল, কালীঘাট যাবে বলে বেরিয়েছিল দুই বুড়ো। হরেন সাধু আর নরেন সাধু। তারা কোথাকার লোক, কোথা থেকে এল এই লোকটার বাড়ি, তা কেউ জানে না। তারা যে আছে তা লোকটা ছাড়া কেউ জানে না। এই যে সেই লোক, সন্ধে হতে তার মনে হচ্ছিল, তার বাগানের নিম গাছের ডালে হাড়-খটখটি পা দোলে। কার পা আর কার পা? ডান পা না বাম পা? সে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে ডাক দিল, এই তোরা কারা, দিসনে কেন সাড়া?

পায়ের দোলা বন্ধ হলো, হরেন নরেনের ভিতর হরেন বলল, আমাদের অত সাহস নেই বাপু, সাড়া দিতে ভয় করে।

তুই দেখছি আচ্ছা ভীতু! লোকটা অবাক হলো। সূয্যি ডোবার পর সে তো ভূত নিরোধক লৌহ কবচ পরে গ্যাঁট হয়ে বসেছে আর নিজের পাদুটি টান টান করে ছেড়ে দিচ্ছে। কেন এমন করা, না তার হাঁটুর মালাইচাকিতে ব্যথা। খ্যাঁচ খ্যাঁচ লাগে। এক ভবঘুরে এসে তাকে এই জ্ঞান দিয়ে গেছে। এতে তার উপকার হচ্ছে মনে হয়। এখন নিম গাছের ডালে কাদের পা দোলে, তা তাকে জানতে হবে। তার বাড়ি, তার বাগান,

তার গাছ, সুতরাং তার জানবার অধিকার আছে বৈকি। কত কিছু জানে সে, কোন গাছে কটা পাখি, কোথায় চাক বেঁধেছে মৌমাছি।

এই তোদের নাম কী?

আমি নরেন, ও হরেন।

কে হরেন?

ও হরেন।

লোকটা খুব মেজাজি, বকুনির গলায় বলল, যার নাম তাকে বলতে দে।

আঁজ্ঞে ও আমার চেয়েও ভিতু, কথা বলতেই চায় না। নরেন বলল।

ভয়ের কী আছে, আমি তো মানুষ।

নরেন বলল, আঁজ্ঞে, মানুষ তো আমরাও হতে চাই।

লোকটা বলল, মানুষ মরে ভূত হয় জানি।

নরেন বলল, মানুষ হয় কী করে স্যার?

তখন অন্ধকারে যেন বজ্রপাত হলো, কড়কড় করে মেঘ ডাকল, কে একজন নিম ডাল থেকে বলে উঠল, সে বলেছিল ভূত মরে মানুষ হয়।

আরিব্বাস, গা কেঁপে উঠল এমন গলা, কী আওয়াজ! এ কে?

নরেন বলল, আঁজ্ঞে হরেন, আমরা যমজ বন্ধু।

বন্ধু না ভাই? লোকটা জিজ্ঞেস করল।

কী জানি কী ছাই, একটা কিছু হবেন। আবার সেই গুমগুমে গলায় স্বর বেরোল।

লোকটা বলল, বলছিলি না ও খুব ভীতু?

ইয়েস স্যার, আমি নিজিই খুব ভীতু, আমার চেয়ে বেশি ও।

লোকটা বলল, ভীতুর অমন হেঁড়ে গলা, ওর গলা শুনলে তো আমার হাঁটুতে খিঁচ লাগছে।

নরেন বলল, আঁজ্ঞে তার জন্য ওর কিছু করার নেই, ও নিজেই নিজের গলা শুনে হার্ট ফেল করে মরেছে, আর ও মরলে আমি একা একা ভয়ে ভয়ে মরে গেছি।

লোকটা বলল,খুব বাজে গলা,ভূত হয়ে ভয় দেখাতে এয়েছিস আমাকে?

আঁজ্ঞে না, ও নিজেই ভীতু, নিজের গলা শুনে কাঁপে, আবার কাঁপতে কাঁপতে কেঁদেই ফেলে, তখন নিজের কান্না শুনেও কাঁপে, আবার কাঁপুনিতে কেঁদে ফেলে, তাতেও ভয়ে...।

থাক থাক আর বলতে হবে না, বুঝেছি। লোকটা হাত তুলে থামালো নরেন ভূতকে।

স্যার আপনি রাগ করবেন না, আমরা এখেনে আশ্রয় পেয়ে খুব ভালো আছি, এমন নিম গাছ, এমন থমথমে জায়গা আমাদের মনোমত হয়েছে, নিমের তেতো গন্ধ আমাদের খুব ভালো লাগে, শুধু একটা অসুবিধে আছে, আপনি যদি দেখতেন স্যার। নরেন বলল।

আপনার দয়ার হেদয় স্যার, আপনি পাআআআরেন্নন্ন। বজ্র কণ্ঠে হরেন বলল।

উফফ,চুপ চুপ চুপ, গাছে যে পাখিরা আছে সব পালাবে। লোকটা বলল।

নরেন বলল, পালিয়েছে স্যার।

তার মানে? লোকটা অবাক।

আমরা আসার পর পাখিরা পালিয়েছে নিম ডাল থেকে। নরেন বলে।

আমি তাহলে ভোরে পাখির কাকলি শুনি না? লোকটা জিজ্ঞেস করে।

আপনার ঘুম খুব গাঢ় স্যার, ঘুমুলি সাড় থাকে না। নরেন বলল।

হুঁ, এক ঘুমে রাত কাবার করে দিই। লোকটা বলল।

নরেন বলল, রাত্তিরে কথা বলি আমরা ফিসফাস, পাখিরা ভয়েই উড়ে গেছে।

লোকটা বলল, এই তোরা কবে এয়েছিস?

তিনদিন স্যার, গেল অমাবস্যার দিন।

হুঁ,সেই কারণে রাতে কড়কড়ি শব্দ হয়, আমার ঘুম ভেঙে গেছে কদিন।

নরেন বলল, স্যার আমাদের একটা নিবেদন আছে।

লোকটা বলল, বলে ফেল।

স্যার,আমরা আপনার বাড়ি পাহারা দিই,চোর এসে ফিরে গেছে দুদিন।

ফুল চোর?

স্যার, আমাদের আবেদন শোনেন। নরেন বলে।

শুনতিই হবে স্যার, না হলি আমাদের এখেনে থাকা হবে না। বাজখাঁই গলায় হরেন বলল।

বল, বলে ফেল। লোকটা হাঁই তুলল। ঘুম এসে যাচ্ছে। অন্ধকার হলেই তার চোখ জুড়িয়ে আসে। ঘুমতে সে খুব ভালোবাসে। ঘুমের ভিতর স্বপ্ন আসে। ভালো স্বপ্ন হলে, মন খুশি হয়ে যায়। প্রথম রাতের স্বপ্নটা ভালো হয়, পরের রাতে ভয়ের হয়, কিংবা হয় না। ভয়ের হলে মেজাজ খিঁচড়ে যায়। গতকাল রাতে সে স্বপ্ন দেখেছিল, মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছে, তখন আকাশে মেঘ এল, বাজ পড়তে আরম্ভ করল। কোথায় পালাবে? পালাবার পথ নেই। ছুটতে ছুটতে শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। এখন বোঝা গেল, এই দুই মক্কেল তখন ফিসফাস করছিল। কী বলতে চায় এরা?

নরেন বলল, তুই বল হরেন।

হরেন হেঁড়ে গলায় বলল, আমি বললে স্যার ভয় পাবে, আমারও কান্না পাবে।

আরিব্বাস, থামরে তুই থাম। লোকটা থামালো হরেন কে। হরেন না যেন, পাঞ্জাব লরির হর্ন।সে থামল। তখন নরেন বলল, রাগ করবেন না তো স্যার?

আরে তোরা বল তোদের আবেদন কী?

স্যার আপনি একা থাকেন? নরেন জিজ্ঞেস করল।

কেন আর কাউকে কি দেখা যায়? লোকটা বেজায় অবাক হলো।

আমাদের মনে হয়, আপনারা দুই জন, যমজ বন্ধুর মতো যমজ ভাই। নরেন বলে।

উফফ,মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। বলছে কি মাথামোটা ভূত? একবার লোকটা নিজে বের হয়, আর একবার তার মতো আর একজন বের হয়। একজন লাল জামা পরে বের হয়, আর একজন বের হয় নীল জামা পরে। তারা তাই জানে দুইটা লোক থাকে এই বাড়িতে। লোকটা অবাক হলো দুই ভূতের ধারণার কথা শুনে। তার নিজের তো দুটি জামা, লাল জামা, নীল জামা। কখনো এটা পরে, কখনো ওটা পরে। কিন্তু সে তো একাই পরে। একাই দুরকম পরে। কখনো প্যান্ট আর লাল জামা। কখনো পায়জামা আর নীল জামা। সেই কথা বলতে নরেন ভূত মাথা নাড়তে লাগল, পা নাড়তে লাগল, গাছ নাড়তে লাগল, শেষে কঙ্কাল হাত কচলাতে লাগল, আপনি স্যার, আপনার ভাইরে বারণ করে দেবেন ভোরবেলায় হরিনাম করতে।

এ আবার কী কথা। ভোরবেলা হরি হরি করে কে? কেউ না। সে তখন ঘুমায়।চিন্তার কথা। তার মানে তার কোনো যমজ আছে, যে নীল কিংবা লাল জামা পরে শেষ রাত্তিরে হরি হরি করে। তাতে ভূত দুই বন্ধুর খুবই অসুবিধে হয়। কিন্তু এরা যে আর একটা কথা বলছে, শেষ রাত্তিরে ফুল তুলতে এসে সে হরি হরি সে থামায় না। তখন তাদের খুব ভয় করে। স্যার সেই লোকটা কি আপনি না আপনার ভাই? অন্ধকারে লাল আর নীলে কিছু তফাৎ ধরা যায় না। সবই কালো মনে হয়।

লোকটা এইবার সিধে হয়ে বসল। তার মানে, শেষ রাতে কে আসে ফুল তুলতে। ফুল চোর। ফুল চোর ভূতের ভয় তাড়াতে হরি হরি করে। লোকটা বলল, বাগানের ফুল তুলতে আসে যে, সে আমি হই বা আমার ভাই হোক, তোমরা ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পার না?

মানুষদের খুব ভয় লাগে স্যার।

ওরে আমার ভুতুরে, মানষিরে ভয় করে, তাহলে ভূত হয়েছিস কেন?

আমরা আবার ফুল বাগানে থাকি, সারাদিন ধরে লাল নীল ফুল দেখি আর বেশি ভয় করে। নরেন বলল।

ওরে আমার কীর্তিমানরে, ফুল বাগানে তোরা ভয় করিস!

হরেন আর পারে না,সে ফুল শুনলেই কেঁদে ওঠে,স্যার গো,ফুল বাগানে আমাদের খুব ভয় করে, আমাদের জন্যি ভাগাড় চাই, মরা গরু, মরা ছাগল, হাড়গোড়, পচা মাছ...

উফফফ, থাম থাম থাম, না পোষায় তো পথ দ্যাখ। লোকটা বলল।

যাব কোথায় স্যার,যদি বাগানে দুটো হাড় আর মরা বেড়াল কুকুর এনে ফেলেন,তবে আমরা বাঁচি।বলল নরেন,দেখুন কেমন কাঁদে আমার বন্ধু হরেন, আপনি স্যার, আপনি কিংবা আপনার ভাই হরি হরি আর করবেন না, বাগানের ফুল রোদে পুড়ে মরুক।

লোকটা বুঝল এই দুজন, নরেন হরেন খুব ঠ্যাঁটা ভূত। ভূত কি ফুল বাগান সহ্য করতে পারে? তার জন্য ভাগাড় চাই, মরা ছাগলের পচা গন্ধ চাই।সে বলল,তোরা চোখ বন্ধ করে থাক,আমি ঘরের ভিতর গিয়ে ভগবানকে টেলিফোন করি, তিনি কী বলেন শুনি, ফুল তো তিনিই ফোটান, তোদের জন্য মায়া হচ্ছে।

আচ্ছা স্যার। রেডি স্যার। চোখ বুঁজলাম স্যার। বলল নরেন হরেন একসঙ্গে।

লোকটা এইবার ভিতরে গেল। নীল জামা ছেড়ে লাল জামা, পায়জামা ছেড়ে প্যান্ট পরল। তারপর হরি হরি করতে করতে বাইরে এল। তখন নরেন বলে উঠল, স্যার বন্ধ করুন ওই নাম, আমাদের গা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, আপনার ভাই কত মন দিয়ে আমাদের কথা শুনলেন, ভগবানকে ফোন করতে গেলেন, হরি হরি না বলে মরি মরি কহেন স্যার।

লোকটা বলল, ফুল চোর এমনি করে হরি বলে?

আপনার ভাইকে তো বলেছি স্যার,ফুল বাগান নষ্ট করে দেন,ফুল চোর আর আসবে না, হরি হরিও হবে না, স্যার আমরা বড় ভীতু মানুষ, আমরা এই গাছ ছেড়ে যাইনে কোথাও, ফুলবাগানটারে নষ্ট করেন স্যার, আপনি পারবেন, আপনার ভাই তো ভিতরে গেল ফোন করতে, আর আসেই না, পুলিশ ডাকছে কি না কে জানে, কিন্তু আমাদের ভয় নেই পুলিশে, হরি শুনলেই গা গুলোয়, মাথায় ব্যথা হয়।

এই তোরা আমারে দেখিস ভোরবেলা? লোকটা জিজ্ঞেস করে।

অনেকটা এমনি, কিন্তু এমনি নয়, আর একটু লম্বা কিংবা আর একটু বেঁটে, সে কি আপনাদের আরেক ভাই?

হ্যাঁ,আমরা সাত ভাই,কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ ধেড়ে, কেউ বেড়ে। বলতে বলতে লোকটা বসল ইজি চেয়ারে। বলল, তোরা নেমে আয় ফুলের বাগানে।

এখন? হরেন বাজখাই গলায় কেঁদে উঠল, কী কহেন স্যার!

ইয়েস এখন। লোকটা বলল, হরি হরি, তোদের নিয়ে কী করি, বাগানে লাফ দে, হরি হরি, ভূত জন্ম মরি মরি, বাগান থাকবে, ফুল ফুটবে, পাখি গান গাইবে, নিমের হাওয়া বইবে, ফুলের সুবাস বাইবে, হরি হরি, কটা ভূত আজ মারি মারি।

ও স্যার, চুপ করুন গো, চুপ করুন। নরেন কিংবা হরেন ভূত কাঁদতে কাঁদতে ধপাস। ধপাস মানে ডাল ভেঙে পড়ল কেউ বা কারা। পড়ল কোথায় না ফুল বাগানে। গোলাপ, বেলি, চম্পক, টগর, কেতকী, জবা, জিনিয়া, ডালিয়া ফুলের হরেক রঙের বাগানে। পড়তেই সব চুপ। কী হলো, তারা গেল কোথায়? লোকটা ডাকতে ডাকতে নেমে এল বাগানে, অন্ধকারে। খুব সাবধানে। গাছ এখন ঘুমতে আরম্ভ করবে। এখন গাছকে ছোঁয়া বারণ। এই ভুতুয়া, নরেন হরেন, তোরা কোন মুলুকে গেলি?

সাড়া নেই।সব চুপচাপ।গাছেরা ঘুমোচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলছে ধীরে ধীরে। ফুলের কুঁড়ি জাগছে বিন্দু বিন্দু করে। লোকটা দাঁড়াল কিছু সময়, কেউ কোথাও নেই। টর্চ জ্বেলে দেখল নিমের একটি ডাল ভেঙে পড়ে

আছে। লোকটা ফিরে এল ঘরে। ঘুমিয়ে পড়ল। কেমন যেন লাগছে। সত্যি তারা গেল কোথায়? পরদিন নতুন আলোর ভোরে লোকটা ঘুম থেকে উঠে বাগানে এল। দেখল নানা রঙের ফুল ফুটেছে বাগানে। নতুন আলোয় ঝলমল করছে সব রঙ। তার মতোই লম্বা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে বাগানের বাইরে। নিচু হয়ে তাকে নমস্কার করে বলল, স্যার আমার নাম নরেন সাধু।

তুমি! লোকটা অবাক হয়ে দেখতে থাকে। একেবারেই যেন তার মতো।

ইয়েস স্যার, আমি নরেন।

হরেন তাহলে কই?

নরেন সাধু হেসে বলল, আপনিই হরেন সাধু স্যার।

আমি! আমার তো কোনো নাম ছিল না। লোকটা অবাক হয়ে বলল।

নরেন হেসে বলল, ছিল, আপনি জানতেন না।

তুমি জানলে কী করে? লোকটা জিজ্ঞেস করে।

ভূত জন্ম পেয়ে স্যার।

তুমি কি ভূত? লোকটা জিজ্ঞেস করল।

নরেন সাধু হেসে বলল,না, আমি কাল রাত্তিরে ডাল ভেঙে ফুল বাগানে পড়ে ফুলের ছোঁয়ায় আবার মানুষ, নিজের জন্মে ফিরেছি।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, আর সেই তোমার যমজ বন্ধু?

নরেন বলল, ছিল না স্যার, আমি নিজেই তার গলায় কেঁদেছিলাম, সাত রকম গলা করতে পারি।

লোকটা বলল, তাহলে তোমাকে নমস্কার।

আপনাকেও নমস্কার স্যার,একা থাকেন, আমার একটু জায়গা হবে, দুই ভাইয়ের মতো থাকব স্যার, আমি নরেন, আপনি হরেন, সাধু মানুষ দুইজনা।

লোকটা তাকে ডাকল, এসো।

নরেন বলল, আমি নীল জামা, আপনি লাল জামা।

লোকটা বলল, পালটে পালটে পরব।

নীল লাল জামা। নরেন বলল।

তারপর নরেন এবং হরেন সাধু সেই ফুলের বাগান আর বাড়িটি নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। লোকটার কোনো নাম ছিল না এতকাল। পেয়েছে। হরেন সাধু।

লাল বই নীল বই



বাবিন মাঠ থেকে ফিরছিল। সন্ধে হয়ে গেছে। একটা ছেলে তাকে ডাকে, তোমার নাম বাবিন ?

হ্যাঁ আমার নাম বাবিন,কিন্তু ইস্কুলের নাম অভিষেক, দুটো নামই আমার ভালো লাগে।

আমার ভালো লাগে তোমাকে,রোজ দেখি ফুটবল খেলো। ছেলেটি বলল।

এখানে আবছা অন্ধকার। কদম গাছের নিচে তো। ছেলেটার হাফ প্যান্ট আর গোল গলা টি শার্ট। ছেলেটা তারই মাথায় মাথায়,৪ ফুট দশ ইঞ্চি হবে। সে ক্লাস সিক্স। এও নিশ্চয় ক্লাস সিক্স? তুমি ক্লাস সিক্সে পড়?

সে মাথা নাড়ল।

পড় না? বাবিন জিজ্ঞেস করে।

পড়ি, আমি নিজেই পড়ি।

কী পড়? বাবিন খোঁজ নেয় যেন।

সে বলল, বই পড়ি।

বই বললে হলো, কী বই?

লাল বই, নীল বই, হলুদ বই, সবুজ বই...।

ইস, এমনি হয় নাকি? বাবিন অবাক। এমন বইয়ের কথা তো সে জীবনে শোনেনি।

হয়, আমার কাছে কত রঙের কত বই আছে, আমি পড়ি।

কে দিয়েছে অমন বই? বাবিন জিজ্ঞেস করে।

সে হেসে বলল, কে জানি কে দিয়েছে।

বাবিন বলল, আমি তোমার বই দেখতে যাব।

এস একদিন, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

বাবিন বাড়ি ফিরল।তার কত বই?ইংরেজি,বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান...। উফ,পড়া আর পড়া।তার ভালো লাগে না এত পড়তে। তার চেয়ে খেলায় কত আনন্দ। কিন্তু পড়তে হবে। না পড়লে মূর্খ হয়ে থাকতে হবে। সে মায়ের কাছে পড়ে। বাবা থাকেন বাইরে। বাবিন বাড়ির সামনের মাঠে খেলে। ইস্কুল থেকে এসেই ছুট। পরেরদিন আবার দেখা। সে দাঁড়িয়ে আছে গাছতলার অন্ধকারে। বাবিনকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, ও বাবিন।

বাবিন জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম?

আমি অবিন।

তুমি অবিন। হিহি করে হাসে বাবিন, তোমার বই কই?

দেখাব, হ্যাঁ গো তোমার ইস্কুলে আজ কী হয়েছে?

কিছু না তো, কী হবে?

সে জিজ্ঞেস করল, ক্লাস টেস্ট হয়নি?

হয়েছে।

তুমি দুটো অঙ্ক ভুল করেছ। সে বলে।

বাবিন বলল,ভুল তো হতেই পারে,আগেরবারে পাঁচটাই ঠিক করেছিলাম।

তখন অবিন বলল, আমার কোনো ভুল হয় না।

বললে হবে ভুল হয় না, ভুল সকলের হয়।

অবিন বলল, আমার ইস্কুলে ভুল নেই।

ভুল নেই মানে ? বাবিন অবাক, তাই কি কখনো হয়?

ভুল হয় না কখনো? অবিন বলল।

বাবিন বাড়ি ফিরে এল। ক্লাস টেস্টের খাতা দেখল মা। ইস, বিয়োগে ভুল না হলে একটা ঠিক হয়ে যেত। আর একটা অঙ্ক লিখতে ভুল। মা বলল, বাবিন এমনি করে পরীক্ষা দিলে হবে?

বাবিন বলল, আসলে আমার ভালো লাগছিল না মা।

কী ভালো লাগছিল না?

পরীক্ষা দিতে। বাবিন নিচু গলায় বলল।

কেন, কী হয়েছিল, পরীক্ষা দিতে ভালো লাগছিল না কেন?

বাবিন বলল, না, বলল না। বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার ক্লাস রুমের জানালা দিয়ে কী সুন্দর আকাশ দেখা যায়। আজ আকাশ ছিল ঘন নীল। আকাশে দুটো ঘুড়ি, লাল ঘুড়ি তার ভিতরে শাদা বল, নীল ঘুড়ি, তার ভিতরে হলুদ মোমবাতি একে অন্যকে ছুঁয়ে দেখতে চাইছিল। পারছিল না। ইস একটা লাটাই যদি তার হাতে থাকত, অন্যটি অবিনের হাতে। সে নীল হলুদ, অবিন লাল শাদা। অবিনের সঙ্গে তার দুদিনের পরিচয়, এর ভিতরেই অবিন তাকে টানছে সব সময়। অবিন বলেছে, তার ইস্কুলে সব রঙিন বই পড়ায়, কত রকম বই, কত রকম চক পেন্সিল, কত রকম খাতা...। ঠিক দুপুরবেলা, বনে বনে, পাহাড়ের দিকে হাঁটো, প্রজাপতির দিকে ছোট, তাদের ইস্কুল এমন করতে দেয় ? দেয় না। শুধু পরীক্ষা নেয়। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান...। বাংলা বইয়ে রয়েছে ‘আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে...’। ছোট নদী দেখেছ তুমি বাবিন?

বাবিন জিজ্ঞেস করল, মা তুমি ছোট নদী দেখেছ?

বলল, দেখেছি কোন ছোটবেলায়।

আমি কি দেখেছি? বাবিনের কৌতুহল হয়। মা বলে ছেলেবেলায় তাকে কোলে নিয়ে বিমানে করে দিল্লি গিয়েছিল। বাবিনের কিছুই মনে নেই। সে কখনো বিমানে ওঠেনি।

দেখবি, দেখার সময় কি পেরিয়ে যাচ্ছে ? মা বলল।

বাবিনরা থাকে যে ভালো গঞ্জে সেখান থেকে বহুদূরে নীল পাহাড় দেখা যায় বিকেলের দিকে। পাহাড়ের দিকে নাকি ছোট একটা নদী আছে।বাবিন বলল, মা, আমরা একদিন যাই, দেখে আসি।

তোর বাবা আসুক।

বাবা থাকে অনেক দূরে চাকরিতে। মাসে একবার আসে। আবার আসেও না। আসতে পারে না। কাজের খুব চাপ। আবার সে জায়গায় ভালো ইস্কুল নেই যে বাবিনকে নিয়ে যাবে। বাবা চেষ্টা করছে খুব। বদলি হয়ে আবার ফিরে আসবে এখানে,তাদের ভালো গঞ্জের পাশের শহরে। বাবিন চুপ করে থাকে। শীত চলে গেল। বসন্ত চলছে। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। দূরে শিমুল গাছে ফুল ফুটেছে কত। বাতাসে শিমুল তুলো উড়ছে। মাদার গাছে টকটকে লাল ফুল।পলাশের বন আগুন হয়ে গেছে। বাবিনের বন্ধু যে অবিন সে থাকে কোন দিকে কে জানে? সেদিন বিকেল শেষ হলে গোধূলিবেলায় আবার তাকে হাতছানি দিল, আমার বই দেখবি না?

কখন দেখি, সকালে পড়া, তারপর ইস্কুল,তারপর এইটুকু খেলা, তারপর বাড়ি, সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকা বারণ, মা একা থাকে, খুব চিন্তা হবে।

হুঁ। অবিন বলল, তাহলে আর কী করে দেখবি তুই।

সত্যি তোমার বই নীল, লাল, হলদে, সবুজ, বেগনে, গোলাপী, কমলা? বাবিন জিজ্ঞেস করে।

হুঁ, শাদা রঙ ফাটিয়ে দিলে যত রঙ হয়, ততো রঙের বই আমার।

বইয়ের ভিতর কী আছে? বাবিন জিজ্ঞেস করল।

পড়া আছে। অবিন বলল।

পড়া? বাবিন আবার জিজ্ঞেস করে।

সব পড়া, তুই যা পড়িস, তাই পড়া। অবিন বলল।

সন্ধে হয়ে গেল। বাবিন বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এসে মাকে বলল, নীল লাল, হলদে সবুজ বই হয় মা?

মা অবাক, হলদে সবুজ বই, ছবির বই?

রঙের বই। বাবিন বলল।

মা চুপ করে থাকল। তারপর বলল, তোর বাবা ফোন করেছিল, এই মাসে আসবে না, মন দিয়ে পড়তে বলেছে।

বাবিন বলল, মন কেমন করে মা।

কেন রে কী হলো?

বাবা কতদিন আসেনি মা।

আসবে,নতুন নতুন বই নিয়ে আসবে।মা বলল, বই কিনেছে, অলিভার টুইস্ট, এ টেল অফ টু সিটিজ, আর হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যখের ধন।

বাবিনের মন ভালো হয়ে গেল। বাবিনের অনেক বই। পড়ার বই আর গল্পের বই। কত বই পড়েছে সে। চাঁদের পাহাড়, মিসমিদের কবচ, বুড়ো আংলা, ক্ষীরের পুতুল, পদি পিসির বর্মি বাক্স,গ্যালিভার'স ট্রাভেল, টাইম মেসিন, হ্যাঞ্চ ব্যাক অফ নোতরদম, এ কানেক্টিকাট ইয়াঙ্কি ইন কিং আর্থোজ কোর্ট...। বাবা বই আনলে সে অবিনকে একদিন নিয়ে আসবে। অবিনকে দেখাবে তার বই। তারা দুজনে একটা লাইব্রেরি

করবে। কী ভালো না হবে। অবিনের সঙ্গে দুদিন বাদে আবার দেখা। ঝাঁকড়া চুল ময়লা রঙ শীর্ণকায় অবিন বলল, এক কাজ করবি, একদিন ফুটবল না খেলে হলুদ বই সবুজ বই দেখতে যাবি।

হ্যাঁ যাব। বাবিন বলল, তার খুব ইচ্ছে করে রঙের বই দেখতে। দেখে এসে বাবাকে ফোনে বলে দেবে লাল নীল সবুজ বই নিয়ে আসতে। বুঝিয়ে দেবে কেমন বই ? বাবা নিজে খুব বই পড়ে, বাবা চায় বাবিনও অনেক বই পড়ুক। মা তো অবসর সময়ে বই মুখেই বসে থাকে। মা নিজেও জানে না লাল নীল বই আছে।

অবিন বলল, তুই সাইকেল আনিস, সাইকেল ছাড়া যেতে পারবি না।

তোর বাড়ি অনেকদূর?

অবিন বলল, হ্যাঁরে, অনেক দূর।

তোর সাইকেল কই?

আমি তো ছুটে যাই। অবিন বলে।

ছুটে যাস মানে?

ছুটেই যাই,প্রত্যেক দিন ছুটে যাই ছুটে আসি।অবিন কথাটা বলে হাসে।

তোর বাড়ি কোন দিকে?

অবিন বলে, সব দিক দিয়ে যেতে পারবি, সব দিকে।

হাসল বাবিন, তুই না কেমন যেন কথা বলিস।

কেমন? অবিন হেসে জিজ্ঞেস করে।

বাবিন বলল, সব দিক দিয়ে এক দিকে যাওয়া যায় ?

অবিন বলল, আগে চ, দেখবি যাওয়া যায় কি না।

সাইকেল নিয়ে পরদিন এল বাবিন। অবিন বল, চ, আমার বাড়ি।

তুই সাইকেলের পিছনে বস।

না আমি ছুটে যাই, আমি আমার মতো যাই, তুই তোর মতো আয়।

বাবিন বলে,আমি আমার মতো যাব কী করে, আমি কি তোর বাড়ি চিনি?

চিনে যাবি, দেখবি 'আমার বাড়ি' লেখা একটা বাড়ি। বলে অবিন ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ছুটতে কতদূর! সাইকেল নিয়ে তার পিছনে ছুটতে লাগল বাবিনও। কিন্তু কোথায় সে। কোথায় অবিন? মিলিয়ে গেছে বাতাসে। তাহলে বাবিন কি যাবে সামনে? না কি ফিরে আসবে? বাবিন ফিরবে না। বাবিন কোনোদিন একা একা আসেনি এই পথে। এই পথে আসেইনি। সে শুধু ইস্কুলে যায় আর ফিরে আসে। আর ফুটবল মাঠে যায়, ফিরে আসে। বাবিন ছুটছে সাইকেল নিয়ে। কতদিন ভেবেছে এই পথে আসবে? তার মনে পড়ল ক্লাসের বইয়ের কবিতাটি, কত দিন ভাবে ফুল উড়ে যাবো কবে ...

কত দিন ভাবে ফুল উড়ে যাবো কবে
যেথা খুশি সেথা যাবো ভারী মজা হবে।
তাই ফুল একদিন মেলি দিল ডানা
প্রজাপতি হলো, তারে কে করিবে মানা!

কী সুন্দর 'আমার বাড়ি'র পথ। ঢেউ খেলানো পথ, লাল মাটির পথ। দূরে দেখা যায় নীল পাহাড়, সবুজ বন। ওইদিকে এক নদী আছে, নদীর নাম, 'ছোট নদী'। আমাদের 'ছোট নদী' নেমেছে ওই নীল পাহাড়ের ঝর্না থেকে। উফ, কী সুন্দর! কত ফুল আর কত ফুল! লাল নীল, সবুজ, হলুদ, গোলাপী, কমলা, বেগনে...। বাবিন দেখতে পাছে সব। দেখতে পাচ্ছে পথের ধারে ফুটে আছে অচেনা ফুলের ঝাড়। কী ফুল গো এইটা। সাইকেল থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করল এক বুড়োকে। বুড়ো হেঁটে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে একা একা। মাথায় তার নীল পাগড়ি, গায়ে তার হলদে জামা, পরণে নীল ধুতি। বলল, এইটা তো ভাট ফুল।

ওম্মা, এই তাহলে ভাট ফুল? বইয়ে পড়েছে ভাটফুলের কথা। সে অবাক হয়ে দেখছে যখন সামনের একটা নিম গাছের ডালে পাখি এসে বসল। ধূসর আর শাদায় মেশানো, লেজটা উঁচু করা ছোট্ট পাখি। কী পাখি গো? বুড়ো হেসে বলল, দোয়েল পাখি, তুমি চেন না?

না গো, এই সেই দোয়েল, শিস দেয় তো?

নাচে গান গায়, শিস দেয়, আমার বাড়ির পাখি। বুড়ো বলল।

তুমি যাচ্ছ কোথায়? জিজ্ঞেস করে বাবিন।

বুড়ো বলল, আমার বাড়ি, তুমি?

বাবিন বলল, আমিও আমার বাড়ি।

কোন দিকে?

বাবিন বলল, সব দিকে।

বুড়ো হেসে বলল, আমার বাড়িও সব দিকে।

তোমার নাম কী গো?

বুড়ো বলল, অবিন, অবিন গো।

ধ্যাত, অবিন হবে কেন? বাবিন বলল, অবিন আমার বন্ধু, আমার মতো বয়স।

বুড়ো বলল,আমার বাড়ির দেশে সবাই অবিন, সবাই বাবিন, যাই আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, সামনে কত কাজ?

কী কাজ তোমার? বাবিন জিজ্ঞেস করে।

ভালো করে সব দেখা,পাহাড়তলীতে কোন ফুল ফুটল, কোন ফুল ঝরে গেল, কোন ফুল ফুটবে, কোনটা ফুটল না, কোন পাখিটা এল, কোন পাখিটা এল না, শিস দিল আর শিস দিলো না, সব হিশেব রাখতে হবে আমাকে, খাতায় তুলতে হয় তবে না নম্বর হবে।

নম্বর, সে কি গো নম্বর দিয়ে তুমি কী করবে?

বুড়ো হেসে বলল, লাল বই নীল বইয়ে আঁকা আছে সব, নম্বর নিয়ে কাউকে দিয়ে দেব, তুমি নেবে?

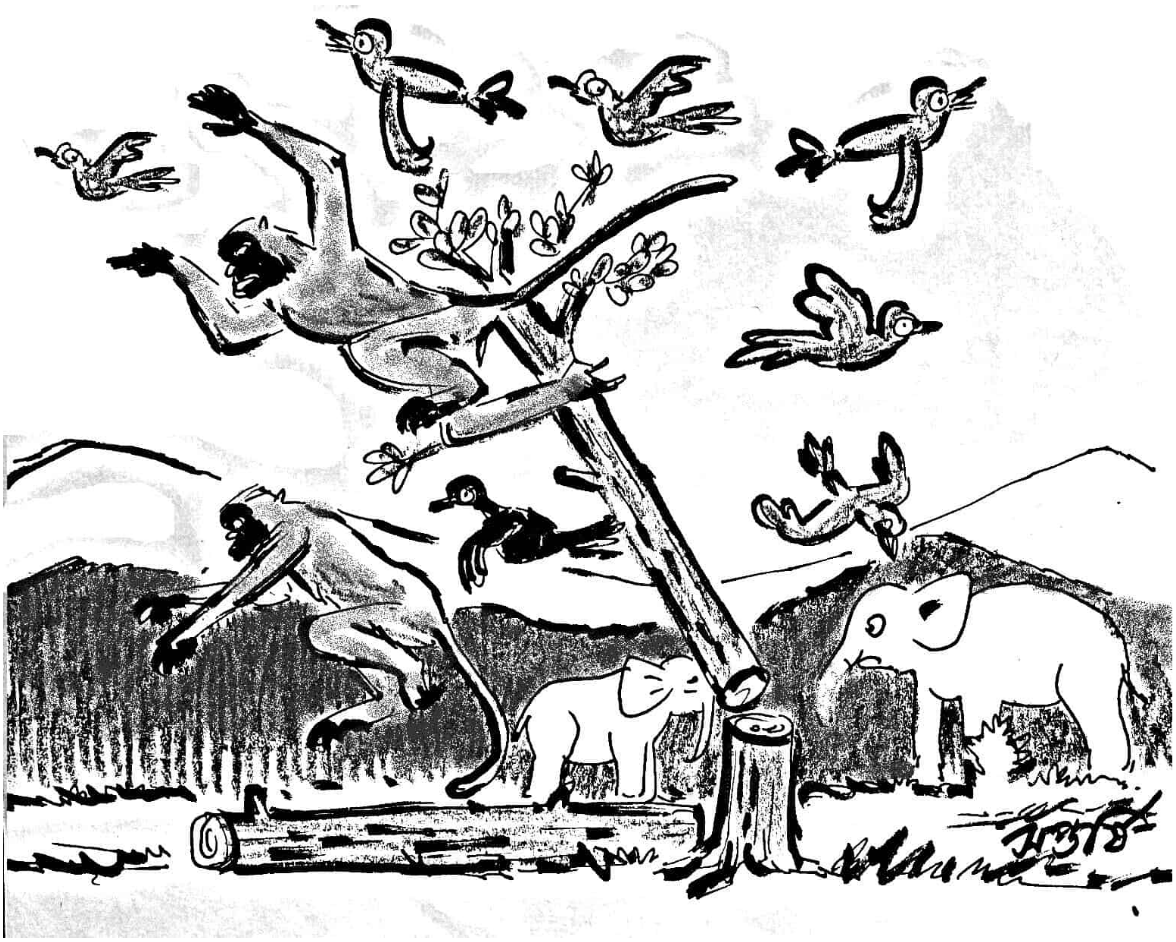
বাবিন হেসে বলল, আমি নিয়ে কী করব?

বুড়ো হেসে বলল, তাও তো বটে, তুমি কী করবে, তাইলে নম্বর বাদ, নেবই না।

বাবিন জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়ি কতদূর?

অনেক দূর বলা যায়, আবার কাছেও বলা যায়, তুমি 'আমার বাড়ি' চলো, লাল বই নীল বই, ভাট ফুল, দোয়েল, শ্যামা, ছোট নদী...। বলতে বলতে বুড়ো হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। বাবিন সাইকেল ঘুরিয়ে নিল। লাল বই, নীল বই, ছোট নদী, নীল পাহাড়, 'আমার বাড়ি' যে সব দিকে। সব দিকে রয়েছে জেগে। লাল নীল পাগড়ির বুড়োর পিছু পিছু যেতে হবে কেন?

ফুলতলার অস্থিরচন্দ্র



এই যে একটা লোক। বেঁটে বলা যায়, আবার লম্বাও। না, লম্বা কিছুতেই না। বেঁটেই। উহুঁ, মোটেই তা নয়, লম্বা।নানা জনের নানা মত। তারা সব মুনি। এই গাঁয়ের লোক সব মুনি।মুনি মানে? দাড়ি আছে নাকি,না নেই। গেরুয়া বসন পরে থাকে নাকি।না, মোটেই না। নিরিমিষ খায় নাকি? একদম না, মাছ ভাত না হলে কারোর ভাতই ওঠে না। তবু তারা নানাজন নানা মুনি। মুনি কেন? নানা মত দেয় বলে। যে মত দেয়, সে জ্ঞানী। আর মুনিরা তো জ্ঞানী হয়েই থাকেন।

যাই হোক, তার নাম অস্থির। অস্থিরচন্দ্র দাস। কিন্তু কেউ কেউ বলে, তার নাম, বালক, বালকচন্দ্র। অস্থির বলে তার অমন কোনো নাম আছে বলে সে জানে না। সে বলে তার নাম অস্থির। অস্থিরচন্দ্র দাস। হ্যাঁ, সে বসে থাকে না, সত্য। আজ এখানে কাল সেখানে। সেই কারণে নাকি অস্থির। লোকের নাম তো মুখে মুখে ছড়ায়। তার নাম ছড়িয়েছে অমনি করেই। অস্থির ঐ লোকটা। এ কথা ফুলতলার সর্বজনেই বলে। অস্থির কেন? না সে সব সময় নাকি চলমান। হাঁটছে। দুদন্ড দাঁড়িয়ে যে বিশ্রাম নেবে সে উপায় নেই। নেই কেন? তা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। আর তা শুনতে হলে অনেক সময় দিতে হয়। যাকগে, কেউ শোনে কেউ শোনে না, কিন্তু আমি বলে যাই। বলাই আমার কাজ।

অস্থিরের বাড়ি অমুক গাঁয়ে। অমুক গাঁ কোথায়, না তমুক শহরের কাছেই। তমুক শহরের খুব নাম। কেন নাম, না তা বললে অনেক কথা বলতে হয়। তার নাম ছিল সবুজ শহর। বনের ভিতর বাড়ি, বনের ভিতরে ঘর। বনের ভিতরে রাস্তা। সব শাল সেগুন, পিয়াল, সোনাঝুরি, আম, জাম, এই গাছে ভরা। সবুজ শহরের নাম চতুদ্দিকে ছড়িয়েছিল। দলে দলে লোক আসত সবুজ শহরে ক'দিন কাটিয়ে যেতে। তার ফলে কী হলো, গাছ কাটা শুরু হলো,শুরু হলো থাকার জায়গা বের করা।বাড়ি হলো কত। সব বাইরের লোক এসে থাকতে লাগল। বাইরের ভালো লোক, মন্দ লোক, দুষ্ট লোক, নিরীহ লোক এসে গাছ কেটে জমি বের করে কুটির বানাতে লাগল। আর তাতে ভালো মানুষ আর মন্দ মানুষ, কোনো মানুষেই টের পেল না সবুজ শহরের সবুজ আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কথা তো সবুজ শহর নিয়ে নয়। আমার কথা লোকটাকে নিয়ে। সেই ঘুরুয়া লোক অস্থিরচন্দ্রকে নিয়ে।তাদের অমুক গ্রামের একটা নাম ছিল, নামটা হলো ফুলতলা। ফুলতলা ছিল ফুলে ফুলে ভরা গ্রাম। কত রকম ফুল, না হরেক রকম ফুল। তাদের হরেক রকম নাম। চম্পা, চামেলি, গোলাপ, অশোক, বেলি, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যমুখী, গাঁদা, দোপাটি, করবী, কেয়া, কেতকী, আর বসন্তে শিমুল, পলাশ ও মন্দার। ...কত ফুল কত রঙ, কত সুবাস। ফুলতলা যেতে হলে জামরুলতলায় নামতে হবে। জামরুলতলা ছিল সবুজ শহরে প্রবেশের মুখে একটি বাসস্টপ। সেখানে শুধুই ছিল আম আর জামরুল গাছ। মস্ত আম গাছ আর জামরুল গাছ। রসে ভরা মিষ্টি আম আর মিষ্টি জামরুল। জষ্টি মাসে আম আর আষাঢ় মাসে জামরুল পাকত। পাখিরা খেত, মানুষে খেত। বালকচন্দ্র কিংবা অস্থিরচন্দ্র বলে, জামরুলতলার আম কিংবা জামরুল যে না খেয়েছে সে বুঝবে কী করে তার সোয়াদ? তার জিভ এখনো আমের রঙে হলুদ হয়ে আছে। অস্থিরচন্দ্র কাকে বলে, না নিজেকে বলে। একা একা ফুলতলা থেকে জামরুলতলা যাওয়ার পথে বটতলায় বসে নিজে নিজে বলে। কেন বলে, না হয়েছে কি, জামরুলতলায় আম-জামরুল কোনো গাছই আর নেই। কে যেন একটা একটা করে কেটে দিল। কেন কাটল, না একটা হনুমানের বাড়ি ছিল সেই আম গাছের মাথায়। হনুমানের যা অভ্যেস, আম খেয়ে তার আঁটি ছুঁড়ে দিচ্ছিল নিচে। সেই আঁটি লাগল একটা দুষ্ট লোকের গায়ে, তার শাদা জামায় দাগ হয়ে গেল। সে খুব রাগী। সে করল কী, পরদিন একটা করাত এনে কেটেই দিল গাছটা। একটা কেন, অনেক। একে একে সব গাছ কেটে দিল রাগ করে। হুঁ, কথাটা সত্যি হতে পারে আবার মিথ্যেও হতে পারে। লোকে বলে, রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে নাকি আম-জামরুল গাছ কেটে দিয়েছে রাস্তা আর বাসওয়ালারা। একজন রাস্তাওয়ালার গায়েই নাকি আঁটি ছুঁড়ে মেরেছিল হনুমান। রাস্তাওয়ালা মানে যারা বালি, খোয়া, পাথর আর পিচ দিয়ে কালো রাস্তা বানায়। গাছ কাটতে হনুমানের ঘর ভাঙল, সে পালিয়েছে বন্দুক দেখে। আর পাখিরাও উড়ে গেছে কোন দিকে যেন। গাছ ছাড়া পাখিরা তো থাকতে পারে না। গাছ ছাড়া হনুমানই বা যাবে কোথায়। এখন জামরুলতলা স্টপ আছে কিন্তু জামরুল গাছ নেই। গাছগুলি সব কোথায় গেল? কে বলবে কোথায় গেল? গাছেদের মাটি নেই তাই তারাও নেই। তো অস্থিরচন্দ্র একদিন তাদের ফুলতলা গাঁয়ের লোকদের বলল, সবুজ শহর আর সবুজ নেই তা জানো?

গাঁয়ের লোক মাথা নাড়ে, তারা জানবে কী করে?

হ্যাঁ, কী করে জানবে? তারা সব স্থির মানুষ। ঘর ছেড়ে আর গাঁ ছেড়ে যায় না কোথাও। তাদের বাড়ির সামনে বাগান আছে ফুলের। তারা সকালে দুপুরে, খুব রোদের সময় গাছে জল দেয়। তাদের গাঁয়ে সবুজ শহর থেকে লোক আসে, ফুল নিয়ে যায় কিনে। এই রকমই চলছিল বহুদিন। ফুল বিক্রি করে ফুলতলার মানুষ চাল, ডাল, নুন, তেল কেনে।বই কেনে। মিঠাই কেনে। কিন্তু আজ কী বলছে অস্থিরচন্দ্র। সে তো গাঁয়ে থাকেই না বড় একটা। এই তো সে গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল গেল ফাল্গুন মাসে।ফিরল এই আষাঢ়ে। আকাশে এখন মেঘ। বাগানে বাগানে রজনীগন্ধা ফুলের চাষ শুরু হয়ে গেছে। গন্ধরাজ গাছে ফুল ফুটেছে। কামিনী গাছে ফুলের কুঁড়ি এসেছে। অস্থির গিয়েছিল কোথায়, না অনেকদূর এক পাহাড়ের দেশে, নদীর দেশে। বলছে, পাহাড় ভাঙতে বড় বড় মেসিন এসেছে নীল পাহাড়ের দেশে। পাহাড়ের আর থাকা হবে না। অস্থির

এক অদ্ভুত মানুষ। পাহাড়ের থাকা হবে না মানে? পাহাড়ের কি পা আছে যে চলে যাবে? সে না হয় অস্থির, কিন্তু পাহাড় তো স্থির বটে।

হ্যাঁ, পাহাড়ের পা নেই, পাহাড় স্থির, নিশ্চল, কিন্তু পাহাড়, ভেঙে পাথর সব চলে যাচ্ছে সবুজ শহরে, মস্ত সব দালান উঠছে, উঁচু উঁচু বাড়ি।

কত উঁচু, শাল গাছের মতো উঁচু? একজন জিজ্ঞেস করে।

অস্থিরচন্দ্র হাসে, তার চেয়েও উঁচু।

আকাশ পর্যন্ত? এক বুড়ো জিজ্ঞেস করে।

প্রায়, কিন্তু আকাশ এমন যে যত তুমি উপরে ওঠো, আকাশও উঠে যাবে উপরে।

বাহ, সেইটা ভালো। বুড়ো বলল।

আর একজন জিজ্ঞেস করল, আর কী খবর অস্থিরচন্দ্র?

অস্থিরচন্দ্র বলল, সবুজ শহরে গাছ কমে যাচ্ছে দিন দিন।

গাঁয়ের বুড়ো অনাথচন্দ্র বলল, আমাদের কী, আমরা তো আর আর সবুজ শহরে থাকতে যাচ্ছি না, আমি সবুজ শহরে যাইনি কোনোদিন।

অস্থিরচিন্দ্র বলল, আমরা সব ফুলের উপর বেঁচে থাকি।

তাইই তো। মাথা নেড়ে আর একজন বলল।

কিন্তু! অস্থিরচন্দ্র কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

অস্থির বলল, জগতের অবস্থা ভালো না।

জগত কী? বুড়ো অনাথচন্দ্র বলল।

সব মিলিয়ে জগত। অস্থির বলে।

সব মিলিয়ে মানে? অনাথচন্দ্র জিজ্ঞেস করে বুঝতে না পেরে।

অস্থির বলল,পাহাড়তলীর গ্রাম, নদীর ধারের গ্রাম, ফুলের গ্রাম, গাছের গ্রাম, মানুষের গ্রাম, পাহাড়, বন, নদী...সব মিলিয়েই জগত।

বুঝলাম কিছুটা, সবটা না। একজন বলল।

পলাশ বলল, সবটা বুঝব কী করে, আমরা যে ফুলতলার বাইরে যাইনি কখনো।

অস্থির বলল, আরো কথা আছে?

কী কথা? পলাশ জিজ্ঞেস করল।

কী বলতে চায় অস্থির? অস্থির তার কুটিরে গিয়ে ঢুকল। মাটির বাড়ি, কিন্তু তার গায়ে শুধু গাছ আর ফুল। দুপুরে চাল-ডাল রাঁধল সে। খেয়ে লম্বা ঘুম লাগালো। বেলা পড়ার আগেই ঘুম থেকে উঠে বাঁশি নিয়ে বসল। বাঁশিতে সুর তুলল। কী সুন্দর বাজায় সে। গাঁয়ের লোক এল তার কুটিরের প্রাঙ্গণে। এক যুবক, যার নাম পলাশবরণ, বলল, হ্যাঁ গো অস্থিরচন্দ্র, তুমি কী বলতে কী বললে না?

অস্থির বলল, আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে, কেন যে চঞ্চল তা বুঝতে পারছি না।

তা শুনে বুড়ো অনাথচন্দ্র হেসে বলল, তোর মন কবে স্থির হয়েছে অস্থির, তোর নাম তো ওই জন্যই দেওয়া, তুই সব সময় চরকির মতো ঘুরছিস।

অস্থির বলল, পাহাড় চলে যাচ্ছে।

পাহাড় আবার যায় কী করে, পাহাড় ভাঙা মানে চলে যাওয়া নয়। একজন বলল।

অস্থিরচন্দ্র বলে, শোনো, পাহাড় মানে হাতির দল, পাহাড়ে গুমগুম ডিনামাইট ফাটছে, হাতির দল পাহাড় ছাড়ছে, দলে দলে চলে যাচ্ছে আরো দূরে, হাতিরাই তো এক একটা পাহাড়।

যদি এদিকে আসে? অনাথচন্দ্র জিজ্ঞেস করে।

অস্থিরচন্দ্র মাথা নাড়ে,বলে,কী জানি,তবে মনে হয় এদিকে আসবে না।

আসতেও তো পারে, তখন বাগান শেষ হয়ে যাবে হাতির পায়ে চেপে।

হুঁ, বুড়ো অনাথচন্দ্র বলল, অঘ্রান মাসে তার মামার বাড়ির গ্রামে হাতি ঢুকে সব ধান নষ্ট করে দিয়েছিল, সে বহুদিন আগের কথা।

অস্থিরচন্দ্র বলল, এমন হয়।

তাহলে আমাদের ফুলের বাগান গেছে! পলাশবরণ বলল।

অস্থিরচন্দ্র বলল, হুঁ, তারা আসবে কি আসবে না, তা তারা জানে, তাদের ঘর ভেঙেছে পাহাড়-ভাঙার দল, মানুষের উপর তারা রেগে আছে।

চুপ করে থাকে সকলে। অস্থির আর কী বলে, তা শুনবে। কিন্তু অস্থির কিছু বলে না।পরদিন সবুজ শহর থেকে পেয়াদা এল। পেয়াদার কালো জামা কালো ধুতি। মাথায় কালো পাগড়ি। কাঁধে বন্দুক। গোল গোল চোখ। মোটা পাকানো গোঁফ। বটতলায় দাঁড়িয়ে সে বলল, হুকুমজারি করতে এসেছে।

কিসের হুকুমজারি? জিজ্ঞেস করে পলাশ।

দেশের মালিক হুকুম দিয়েছেন এই ফুলতলা গ্রামে কারখানা হবে।

অস্থিরচন্দ্র বলল, এ তো আমাদের ফুলের বাগান, ফুল চাষ ফুলতলার মানুষের কাজ।

পেয়াদা বলল, মালিক হুকুম দিয়েছে, ফুলতলায় ফুলের কারখানা হবে।

সে আবার কী কথা,ফুল তো গাছে হয়।অস্থিরচন্দ্র বলল, কারখানায় ফুল হয় বলল কে?

পেয়াদা বলল, মিঠাই আর জল দাও, তাহলে সব খোলসা করে বলি।

পেয়াদাকে মিঠাই আর জল দেওয়া হলো। গোটা একটা পাকা কাঁটাল দেওয়া হলো। খেতে খেতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকতে লাগল। সকলে বসে থাকল চুপ করে। ভাবতে লাগল, ফুলতলায় সবই তো ফুলের বাগান। যত দূর চোখ যায় ফুলের রঙ আর রঙ। আর আছে আম কাঁটালের বাগান। এর ভিতরে কারখানা হবে কোথায়? কারখানা মানে অনেক জমি। ফুলের বাগান নষ্ট হবে। এইসব যখন ভাবছে সবাই, পেয়াদা উঠে বসল, বলল, মালিক হুকুম করেছে, ফুলতলায় ফুলের কারখানা হবে, প্লাস্টিক ফুল, সেই ফুল টেকে অনেক দিন, সাবান জলে ধুয়ে নিলে নতুন। মালিক বলেছে, ফুলতলার জমিতে ফুলের কারখানা হবে, মেসিনে ফুল বেরোবে।

আমরা, আমরা কোথায় যাব? পলাশ জিজ্ঞেস করল।

কারখানায় কাজ করবে। বলল পেয়াদা, সব জানিয়ে গেলাম, যদি কাজ চাও পাবে, না চাও তো যাবে।

কোথায় যাব? পলাশ জিজ্ঞেস করল।

যেদিকে দু’চোখ যায় চলে যাবে, কাল থেকে জমি মাপা হবে, পাঁচিল দেওয়া হবে, আর ফুল চাষ হবে না, সবুজ শহরে গাছ নেই, যা আছে সব প্লাস্টিকের গাছ। তারা প্লাস্টিক ফুল চায়, প্লাস্টিক গাছ চায় যাতে হনুমান, ভ্রমর আর প্রজাপতী না ঘুরঘুর করতে পারে। পেয়াদা গোঁফ মুচড়োতে মুচড়োতে বলল, প্লাস্টিক গাছ হলে আর মানুষও আসবে না গাছতলায়, হাওয়াও হবে না, পাখিরা বসবে না ডালে ডালে। পাখিরা কলরব, কিচির মিচির করতে পারবে না। কিচিরমিচিরে ঘুমতে পারে না মালিক।

সকলে চুপ।অস্থিরচন্দ্র এমনি দশ দিকে ঘুরে ঘুরে খবর আনে। প্রতিবার যখন ফেরে কত ভালো কথা বলে বিকেল থেকে সন্ধে রাত পর্যন্ত, কিন্তু এইবারই পেয়াদার খবরে চুপ হয়ে গেল। কী সব্বোনাশ! বাগান তুলে দিয়ে ফুলের কারখানা হবে। প্লাস্টিকের ফুল এসে আসল ফুলের গাছ নষ্ট করে দেবে।ফুলেদের বাড়ি হলো গাছ। গাছ থাকবে না। ফুল না থাকলে ফুলতলার মানুষও থাকবে না।

অস্থিরচন্দ্র বলল, এমনি হয়েছে অনেক দেশে, ফুলের ঘর নেই তাই ফুল জন্মায় না।

আমরা? পলাশ জিজ্ঞেস করে, আমাদের কী হবে?

অস্থিরচন্দ্র বলে, আগে ফুলতলার মানুষ ঘর ছাড়া হবে, তারপর ফুল।

কত রাত পর্যন্ত সকলে জেগে থাকল। জমি মাপতে কাল সকালে জমি মাপার আমিন আসবে। আমিনের দল ফুল বাগানের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। ফুল তার পায়ের তলায় থেঁতলে যাবে।সকলে অন্ধকারে বসে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। অস্থিরও ঘুমায়। কিন্তু শেষ রাতে মনে হলো মাটি দুলছে। কেন? ভূমিকম্প হলো নাকি? ডাকছে কারা? এ ডাক তো চেনা। লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে অস্থিরচন্দ্র তার ঘর থেকে। ছুটতে থাকে। কারা এসেছে? চাঁদের আলোয় দেখতে পায় পাহাড় ঘিরে রেখেছে ফুলের বাগান আর ফুলতলা। ও পলাশবরণ, ও অনাথকাকা, ও শিমুল, ও গোলাপ, ও চন্দ্রমল্লিকা, বেরিয়ে এস বেরিয়ে এস। ঘরছাড়া পাহাড়ের দল এসেছে। ফুলতলার বিপদের কথা শুনতে পেয়ে ফুলের বাগান ফুলতলা ঘিরে নিয়েছে। ফুলতলার অধিকাংশ মানুষের নাম ফুলের নামেই। তারা সব বেরিয়ে এসে দেখল চাঁদের আলোয় মস্ত মস্ত পাহাড়ের মতো হাতি দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। একটা নয় অনেক। অনেক। ভোর হলে ঘরছাড়া হাতিরা তাদের ফুলের বাগান, বাগানের ফুল আর কুটির ও কুটিরের মানুষজনকে রক্ষা করবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, হাতিরা খবর পেল কী করে?

অস্থিরচন্দ্র জানে, পাখিরা খবর দিয়েছে। মানুষ পশু-পক্ষীর ভাষা না বুঝলেও পশু-পক্ষী মানুষের ভাষা খুব ভালো বোঝে। মানুষের স্বভাব তারা জানে। জগতের কথা তারা অনেক বেশি জানে। সুতরাং ...।

রঙের বাহার



এই একটা ছেলে। খুব বেখেয়াল। আর বলা যায় দুষ্টুও। দুষ্টুর শিরোমণি। এর সব উলটো।খাওয়ার সময় ঘুমোয় ঘুমোনর সময় খায়। পড়ার সময় গান শোনে, ঘুমের সময় পড়ে। এর সব উলটো।যখন সবাই টিফিন খায়, এ তখন খায় ভাত। ভাতের সময় রুটি। রুটির সময় ভাত। এর নাম লবন। লবন কারো নাম হয়? হয় হয়, না হলে এর নাম হবে কেন তা?

এর বোন আছে ঝাঁকড়া চুলের ছোট।গোল গোল চোখ।হাত নেড়ে কথা বলে আর গিন্নিগিরি করে।বোনের নাম চিনি।তারা ভাই বোন হলো নুন চিনি। লবন আর চিনি। তারা কিন্তু তোমার বয়সী। তোমার যদি বারো হয়, লবন তখন বারো। তোমার যদি সাত হয় লবন তখন সাত। তোমার বোন যদি চার হয়, চিনি তখন চার। নাহলে সে পাঁচ হতে পারে, ছয় সাত, নয় দশও হতে পারে।

সেই যে লবন সে এখন অঙ্ক কষতে বসেছে। অঙ্ক মানে যোগ। যোগ বিয়োগ। গুন ভাগ। যোগের উলটো বিয়োগ। গুনের উলটো ভাগ।

৫+৫= ১০ না হয় শূন্য।

৫-৫=০ না হয়ে দশ।

লবন সব সময় উলটো উত্তর করে। স্যার গোল্লা দেবেন। একটায় গোল্লা দিলে অন্যটায়ও গোল্লা। কিন্তু বলে, স্যারের ভুল। আমি তো উলটো কষেছি। স্যার উলটো করে উত্তর দেখলে ঠিক নম্বর পেয়ে যেতাম। দশে দশ। প্রথমটায় দ্বিতীয় উত্তর লিখে দিলে আর দ্বিতীয়টায় প্রথম উত্তর ভেবে নিলে সে দশে দশ পেয়ে

যেত। স্যারের ভুল। তার ভুল নয়। কিন্তু স্যারের কি ভুল হয়? হয় না। তুমি যদি উলটো করো, পাল্টা করো, স্যার কেন উলটো করবেন, পাল্টা করবেন ? লবন একটা বিচ্ছু ছেলে। তবু অঙ্কের স্যার তাকে ভালবাসেন খুব। বিজ্ঞানের স্যারও। ভুগোলের স্যার জানেন লবন সব জানে, কিন্তু ইছে করে ভুল বলে।

কী বলছ, এই করে সে নম্বর পায় না? পায় না,পায় না।নম্বর দিয়ে কি ধুয়ে খাবো? লবন হাসতে হাসতে বলে। ক্লাসে উঠতে পারবে না যে। তাই নাকি?অ্যানুয়াল পরীক্ষায় সে অমনি করে না। তখন খাতা ভরা নম্বর। পারলে একশোয় তার বেশি পেয়ে যায়। স্যারের ভুল। কিন্তু সারা বছর তার ভুল তার ভাল। লবন হলো এমনি। ইস্কুল যায় না? যায় আবার না। কিন্তু সব গোল পাকিয়ে দেয় ভাই বোনে। নুন চিনিতে। হ্যাঁ, চিনি কিন্তু অতটা অমনি না। সে যেমন শান্ত তেমন কটকটি। সে পড়ে ক্লাস থ্রি। থিরি না মিছিরি। এই চিনি শোন।

চিনি বলে, কী হয়েছে বল।

এই চিনি, ওই দ্যাখ পিঁপড়ে। ক্লাস ফ্রেণ্ড খোকা বলে।

চিনি একটুও রাগে না, বলে, এই খোকা শোন।

খোকা বলল, কী বলছিস বল।

খোকা তোর মাথায় দেবে টোকা।

খোকা বলল, এই চিনি, জলে ডুবলে আর দেখা যাবেনি।

চিনি শান্ত হয়ে বলে, এই খোকা তুই কেনরে এত বোকা।

খোকাও কম যায় না, চিনিরে চিনি, পয়সা দিয়ে কিনি।

চিনি বলে, খোকারে খোক..., মেলাতে না পেরে, চিনি হেসে বলে, খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কুলে, ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে, ওরে খোকা বাড়ি আয়, দুধ মাখা ভাত কাগে খায়...। ইস খোকা কিচ্ছু পারে না, দুধ ভাত খেয়ে ঘুমায়।

খোকা আর চিনি এক ক্লাসে পড়ে কি না, তাই খুব ভাব। ক্লাস থিরি... উঠতে গেলে একটা দুটো তিনটে সিঁড়ি। তারা তিন সিঁড়ি উঠতে উঠতে এই সব গল্প করে। তখন চিনির দাদা লবন ক্লাস এইট। শ্রেণী তার অষ্টম। ছেলে বড় দুষ্টম। চিনি বসে বাইরের আকাশে তাকিয়ে। বিজ্ঞানের স্যার বিজ্ঞান পড়াচ্ছে। তার কান স্যারের দিকে, তার চোখ জানালার বাইরে। এখন ভাদ্র মাস। ইস্কুলে আসার সময় দেখেছে, আকাশে নীল শাদা মেঘ। মেঘের দল ভেসে ভেসে কত দূর চলেছে! আহা মেঘেদের কত মজা, যতদূর ইচ্ছে যাই, কিন্তু সেই আকাশে কোথা থেকে উড়ে এসেছে এক কিম্ভুত-কিমাকার মেঘ। যেন দত্যি দানবের ভাই। ঘন ঘন গর্জন করছে। যেন নাক ডাকছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, তার বাবা ডাকে অমনি। হেঁইও রে হেঁই নাসিকা, দিচ্ছি এক ঝটিকা। ঝটিকা মানে ঝড়। কিন্তু কুজ্ঝটিকা মানে কুয়াশা। কী করে হলো? বড় হয়ে বোঝা যাবে।

চিনি দেখেছে আকাশ কালো। শাদা মেঘ খেয়ে নিয়েছে কালো মেঘ। চিনির মনে হচ্ছে, যা না, এই ভুতের মতো অদ্ভুত মেঘ চলে যা, এই বিষ্টি থেমে যা, মিষ্টি আমড়া খেয়ে যা। কালো মেঘ কালো মেঘ, আর কতদিন? ডেকে ডেকে চমকাবি, তা ধিন ধিন। কালোমেঘ কালোমেঘ এইবার তুই যা, আলুকাবলি খেতে দেব, যেতে যেতে খা। সে একটু গেয়ে ওঠে এই সব, বিষ্টি তার একটুও ভালো লাগেনা। লেবুর পাতায় করমচা, এই বিষ্টি থেমে যা। দিদি দিদি ও অঙ্ক দিদি।

অঙ্ক দিদি বললেন, কী হয়েছে চিনিমিনি?

চিনি বলল, আমার না, আমার না, আমার না...।

তোমার না তোমার না তোমার না, চিনিমিনি কী বলছ, অঙ্ক খাতা কই? অঙ্ক দিদি বললেন।

খোকা আর চিনি খুব পরামর্শ করে। চিনি যখন না না করে, খোকা তখন হ্যাঁ হ্যাঁ করে। কিন্তু চিনি যে খোকার সঙ্গে আড়ি করবে, তা হয় না, তা হয় না। খোকা বলল, চুপ করে বস না চিনি।

চিনি বলছে, ধুর চুপ করতে ইচ্ছে করছে না।

ইস, কেলাসে কেউ কথা বলে?

চিনি যে কটকটি, বলল, কথা না কী বলে ?

খোকা বলে, পড়া বলে।

অঙ্ক দিদি ডাকলেন, এই চিনি, এই ভাগটা কষে দাও বোর্ডে এসে।

কথা যে অমান্য করবে, তা হবে না। চিনির বুক করে দুরু দুরু, ভাগাভাগি হয় শুরু। বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে খড়ি দিয়ে ভাগ কষতে লাগল সে। ইস, ভাগ মিলল না। ১ রইল অবশিষ্ট। চিনি চুপ করে তাকিয়ে থাকে দিদির দিকে। কিছুতেই এক বাদ দেওয়া গেল না। ভাগশেষ নিয়ে করবে কী চিনি? দিদি বলল, রাইট, চিনিমিনি ঠিক করেছে। আর তাই শুনে চিনি বলল, ও দিদি, দিদি,আমি আর কিছু করি?

কী করবি তুই ?

চিনি ভাবল কী করে। নেচে নেচে লেবুর পাতায় করমচা। ও দিদি, বিষ্টি যে থেমে গেল। সত্যি তো শাদা মেঘ আবার ফুটেছে আকাশে। কালো মেঘ, হুতুম মেঘ নেই আর। রোদ উঠছে গো। চিনিমিনি হাত নাড়িয়ে গেয়ে উঠল, মেঘের কোলে রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি...।

আরে কী করিস কী করিস চিনিমিনি! অঙ্ক দিদি বলে উঠলেন।

মেঘের কোলে,ওই দ্যাখো দিদি মেঘের কোলে...রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি।

এই রে কী হলো, ক্লাসসুদ্ধ সবাই গাইতে লাগল, মেঘের কোলে রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি...।

অঙ্ক দিদি বাইরে তাকালেন, শরতের আকাশ থেকে এক পশলা নামছিল যে গুরু গুরু গরজে গরজে, তা কখন গিয়েছে থেমে, নীল আকাশে ভেসেছে শাদা মেঘের ভেলা। আহা কী সুন্দর আকাশ আর পৃথিবী!

ক্লাসের সবাই গাইছে মেঘের কোলে রোদ উঠেছে। চিনিমিনি নাচছে তার সঙ্গে। আর তখনই না কয়েক মিনিট বাদে বাজল ঢং ঢং ঢং...। ইস্কুলের ছুটির ঘন্টা ঠিক দুপুরেই বাজিয়ে দিল কে। ঢং ঢং ঢং। ছুটি ছুটি ছুটি। ক্লাসঘর থেকে আনন্দের ফোয়ারা বেরিয়ে এল যেন। আর কি উপায় আছে ইস্কুল বসানোর? দুষ্টু থেকে শান্তশিষ্ট ছেলে মেয়েরা সবাই সব ক্লাস থেকে ছুটিই বলতে বলতে বেরিয়ে এল। তাই শুনে হেড স্যার, বিজ্ঞান স্যার, অঙ্ক দিদি, ভুগোল স্যার, বাংলা ইংলিশ সব স্যার আর দিদিরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, কে ঘন্টা বাজাল, কে কে কে। সব স্যারেরা বেরিয়ে এল বাইরে। হুম কে বাজাল ছুটির ঘন্টা? কার আদেশে ছুটির ঘন্টা? অষ্টম শ্রেণীর দুষ্টম ছেলে লবন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। ঘন্টা হাতে ছুটির ঘন্টা সে বাজিয়ে সবাইকে বের করে এনেছে ক্লাস থেকে। ঘন্টা বাজিয়েই চলেছে।

এই তুই কী করলিরে? হেড স্যার বেত হাতে মারবেন কি মারবেন না ঠিক করতে পারছেন না।

লবন বলল, মেঘের কোলে রোদ উঠেছে স্যার,আজ রবি ঠাকুরের ছুটি।

হেড স্যার খুব রাগী। রাগী না হলে হেড স্যার হয়ই না। হেড স্যারকে হাসতে নেই। বেশি কথা কইতে নেই। লবনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ইস্কুলের মাঠে, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক। লবন দাঁড়াল। কান ধরলও। তারপর চোখটা আকাশে তুলে দিল। এই যে দ্যাখো। সবাই দ্যাখো। কী দেখবে? রাম ধনু। সাত রঙের রাম ধনু দ্যাখো সবাই, চিনি তার মিঠে গলায় বলে উঠল। আহা তাই তো। এখন আশ্বিন মাস। এই কিছু আগে এক পশলা হয়ে গেছে। রোদ উঠছে বৃষ্টি ভেজা। লবন যেন জানত এই সময়ে রামধনু উঠতে পারে। তাই ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দিয়ে কান ধরে মাঠের ভিতরে দাঁড়িয়ে। ইস্কুলের দাদারা, ভাইয়েরা, দিদিরা, বোনেরা, বন্ধুরা সবাই ইস্কুলের বই খাতা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে। মেঘের কোলে রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটিরে ভাই আজ আমাদের ছুটি...।

লবন বলল, আমি যেই শুনেছি চিনির গান, তেমনি ঘন্টা বাজল মনের ভিতর।

হেড স্যার আর সব স্যাররা করবেন কী? লবনকে ঘিরে আর সবাই যে নেচে নেচে গাইছে,মেঘের কোলে রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি..., আকাশ সেজেছে রঙের বাহারে। রঙের ধনু এক দিক থেকে উঠে অন্য

দিকে নেমেছে। স্যারেরা হাসছেন লবনের কাণ্ডে। ওরে লবন, কানের থেকে হাত নামা, রঙের থেকে একটু নামিয়ে নে। সেই রঙেতে রাঙিয়ে দে। ছুটি ছুটি ছুটি। আজ আমাদের ছুটি রে ভাই আজ আমাদের ছুটি।

এক সিং ডাকাতের গল্প



আবার এক ডাকাতের কথা। রোগা লিকলিকে, সিড়িঙ্গে, হুমদো কত ডাকাতের কথা শুনেছি আগে। হুকুম সিং, গরম সিং, তেজা সিং, লাখমন সিং...কত সব ডাকাত।এইয়া গোঁফ, এইয়া চোখ, মুখে হিন্দি বোলি। এখন বলছি আর এক ডাকাতের কথা। সবার চেয়ে বড় ডাকাত। ডাকাত বলে ডাকাত। চরকির মতো ঘুরছে সে। এটা ভাঙছে, ওটা ভাঙছে, হি হি করে হাসছে, হাত পা ছড়িয়ে কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে হাসছে, হাসতে হাসতে কাঁদছে। তার নাম ডাকু জঙ্গল সিং দিয়েছে ছোট পিসি। ছোট পিসি আর মেজকাকার আদরে আদরে তার এই অবস্থা।মস্তবাড়ি একতলা দোতলা। তার অনেক ঘর।অনেক ঘরের দরজা খোলা। কোনোটা পিসির ঘর, কোনোটা কাকুর ঘর, কোনোটা গণেশদাদার ঘর, কোনোটা তার মা-বাবার, দাদার ঘর, দিদির ঘর। শুধু তার নিজের কোনো ঘর নেই। তার বয়স পাঁচ, একদিন সে বায়না করেছিল ঘর চাই তার ঘর চাই, তা শুনে মেজকাকুর ঘরে দুদিন থাকতে বলল তাকে মা, থাকতে পারলে ঘর পাবি তুই, একটা ঘর তালা দেওয়া আছে, খুলে দেওয়া হবে তোকে।

তার নাম গুগুল। এই নামটা দিয়েছে তার ছোট পিসি মিলি। সে যে একটা ডাকাত,এ বিষয়ে বাড়ির সবাই একমত। এমন কি ঠাকুমাও। ঠাকুমার ঘরে হরেক জিনিশ। বুড়ির ঘরে গান বাজে সব হরেক রকম। আর আছে অনেক বই। ঠাকুমা লেখেন। গল্প লেখেন। সেই গল্প গুগুল শোনে। মাঝে মাঝে তাঁর ফোন আসে। ফোনে তিনি গম্ভীর হয়ে কতরকম কথা বলেন। গুগুল ঠাকমার ঘরে গিয়ে তেমন ডাকাতি করতে পারে না। শুধু বই আর বই। আর ম্যাগাজিন। এই বাড়িতে কোন ঘরে বই নেই ? তার নিজেরও বই আছে। ছবির বই, আঁকার বই, ছড়ার বই, গল্পের বই। এখন তার ছয়। ক্লাস ওয়ান। ঠাকমা অনেক গল্প জানে। ডাকাতি

করলে সেই সব গল্প বন্ধ হয়ে যাবে, সেই ভয়ে সে নিরস্ত হয়েছে। না হলে কী আর ছাড়ত, ঠাকুমার চশমা, বাঁধানো দাঁত, মোবাইল ফোন, কোনটাতে তার নজর নেই? আর বইয়েও যে নজর নেই তা নয়। বইয়ে হিজিবিজি দাগ টেনে দিল পেন্সিল দিয়ে। তার অনেক রঙের পেন্সিল আছে। কোনোটা ঘষলে লাল, কোনোটায় সবুজ, কোনোটায় নীল কিংবা হলুদ। শ্রীমান গুগুলের শুধু শাদা কাগজ দরকার। ঠাকুমার ঘরে আছে। কিন্তু তাতে হাত দেওয়া বারণ। কম্পিউটার থেকে লেখা ছেপে বের হয় ওই কাগজে। ঠাকুমা কম্পিউটারও নিয়েও বসেন। গুগুলের খুব ইচ্ছে কম্পিউটারের সামনে সেও বসে। যা ইচ্ছে বোতাম টিপে নানা রকম ছবি বের করে।উপায় নেই। ঠাকুমা ঘর থেকে বের হয় না। এমন ঠাকুমা ভূভারতে আছে? কোথায় রান্না ঘরে গিয়ে রান্না করবে, পিঠেপুলি করবে, তা না শুধু ঘরে বসে পড়া আর লেখা। কম্পিউটারেও হাত দেওয়ার উপায় নেই। খবরের কাগজ ছিঁড়তে তার খুব ভাল লাগে। উপায় নেই। তাও কি করে না? করে। না করলে সে করবে কী? ডাকাতের মান তো রাখতে হবে। ছোট পিসি মিলি তাকে বোঝায়, খবদ্দার ঠাম্মার ঘরে নো ডাকাতি, ঠাম্মা ডাকাতের গল্প লিখছে।

কী লিখছে? গুগুল জিজ্ঞেস করে।

এক যে ছিল ডাকাত, এই গল্প।

কই বলে না তো। গুগুল বলে।

বলবে বলবে, লেখা হোক। ছোট পিসি বলে।

গুগুল এরপর ঠাকমার ঘরে ঢুকে দেখে তিনি মন দিয়ে কম্পিউটারে কী লিখছেন। গুগুল নিঃশব্দ পায়ে ঢুকতে পারে। আর নিঃশব্দ পায়ে ঢোকা মানে, কিছু একটা করবে। কী করবে? ডাকাতের গল্প মানে কি তার গল্প? তার কথা লিখছে ঠাকমা? সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। ঠাকমা ডাকাতের গল্প লিখেই যাচ্ছে। কী লিখছে ধরতে পারছে। কিন্তু ভাল ভাবে ধরা তার পক্ষে সহজ নয়। লেখাটা পড়তে পড়তে উঠে যাচ্ছে। তার মনে হল হুম করে কম্পিউটারের কি বোর্ডে হাত দিয়ে এ, বি, সি, ডি, আঙুল দিয়ে পর পর টিপে দেয়। একদিন দিয়েছিল। ঠাকমা তাকে কোলের কাছে টেনে বলেছিল, অমন করতে নেই, গুগুল সোনা।

সে ঠাম্মাকে ডাকে, কী করছ?

লিখছি তো দেখছ।

গুগুল বলে, এর ভিতরে গুগুল আছে না?

আছে।

গুগুল সব জানে?

ঠাম্মা অবাক হয়ে তার দিকে ফিরল, কে বলল?

পিসি।

ঠাম্মা মুখ টিপে হাসলেন, বললেন, তোমার কি তাই মনে হয়?

গুগুল বলল, হুম।

হুম মানে?

গুগুল বলে, হ্যাঁ।

আচ্ছা, তুমি সব জানো? ঠাম্মা জিজ্ঞেস করল।

গুগুল বলল, হুম।

ঠাম্মা তখন বলল, গল্পটা আটকে গেছে।

তার মানে? গুগুল জিজ্ঞেস করে।

ঠাম্মা কম্পিউটার বন্ধ করে গুগুলকে বলল,আয় দুজনে শুয়ে গল্প করি।

অদ্ভুত ব্যাপার। ঠাম্মা লেখা থামিয়ে গুগুলকে নিয়ে শুলো, গুগুল ঠাম্মার গলা জড়িয়ে বলল, তোমার ডাকাতের গল্পটা শোনাও দেখি।

ঠাম্মা বলল, ওই গল্পই তো আর মনে পড়ছে না রে সোনা।

ভুলে গেছ?

ঠাম্মা বলল, কী জানি ভুলে গেছি কি না কে জানে।

গুগুল জিজ্ঞেস করে, ডাকাতটা কেমন দেখতে বল।

ঠাম্মা হেসে বলে, এক রত্তি ছেলে আর এক রত্তি ডাকাত।

তার মানে? গুগুল জিজ্ঞেস করে।

ঠাম্মা তার গাল টিপে দিয়ে বলল, তোর মতো।

ওম্মা, তা কী করে হবে?

তাই তো রে সোনা। ঠাম্মা বলে।

তাহলে আর গল্প কেমন হবে? গুগুল হতাশ হয়।

তখন ঠাম্মা বলে,শোনরে গুগুল গুগুল শোন, সেই ডাকাতের বয়স পাঁচ, ক্লাস ওয়ান, এটা ভাঙে ওটা ভাঙে, একটুও স্থির হয় না, সব সময় মনে মনে ছক করছে, হারে রে রে রে, করে ঝাঁপিয়ে পড়বে কার উপর।

গুগুল বলে, হম, বুঝেছি, আমাকে নিয়ে লিখছ।

কী করে বুঝলি তুই?

গুগুল বলে, খুব বুজতে পারা যায়, কিন্তু গল্প তোমার হবে না।

কেন রে সোনা হবে না কেন?

গুগুল বলে, আমাকে নিয়ে লিখছ, তুমি কি আমার মতো জান আমার কথা?

কেন জানব না? ঠাম্মা বলল।

উঁহু, কিছুই জান না।

ঠাম্মা বলে, জানি জানি জানি।

গুগুল বলে, মোটেই না, যা জান না, গুগুল তোমাকে বলে দেয়।

উফ! ঠাম্মা তখন বলে, তুই তাহলে বলে দে।

তখন এই যে ডাকাত, ডাকু গুগুল সিং বলতে লাগল ডাকাতের গল্প। কী আশ্চয ব্যাপার, সে নাকি গল্প বলবে আর সেই গল্প লিখবে ঠাকুমা। গুগুল বলে, একদিন রাত্তিরে সেই ডাকাত,আর পাঁচটা চেলা নিয়ে...ও ঠাকমা চেলা মানে কী গো?

ঠাকমা হেসে বলে, সাগরেদ।

তার মানে?

না জানিস তো বললি কেন? ঠাকমা বলে।

গুগুল বলে,তুমিই তো লিখেছ ডাকাতেরা চেলা নিয়ে ঘোরে, হুকুম সিং-এর চেলা ভোলা আর কোলা, তাদের মাথায় তখন সিং হয়নি।

ঠাকমা বলে, হুম, কবে লিখেছিলাম?

তা তো জানি না, তবে মনে হয় তোমার গল্পে আছে।

ঠাকমা মুখ টিপে হাসে। এই কথাটা গুগুল থেকে জানা গেল। গুগুল বলে, ভোলা আর কোলা দুই চেলা একদিন রাগ করে বলে, ভাত খাব না।

ও ছেলেরা ভাত খাবি নে কেন, নেহি খায়েগা? হুকুম বলে।

ভোলা বলে, আমরা কি চিরকাল তোমার চেলা হয়ে থাকব?

কোলা বলে, তুমি হলে ডাকু হুকুম সিং, আমি কেন ডাকু কোলা সিং হব না?

ভোলা বলে, আমি কেন ডাকু ভোলা সিং নই বল।

তখন হুকুম সিং বলে, তোদের মাথায় সিং গজাক।

ভোলার খুব বুদ্ধি, বলে, তোমার মাথায় সিং কই হুকুম সিং?

হুকুম সিং বলে, নাপিতের কাছে জমা রেখেছি।

তখন ভোলা কোলা দুই চেলা চলল নাপিতের বাড়ি। নাপিতের মাথা নেড়া। গোঁফ নেই। নাপিত তখন এইটুকুনি আয়নায় নিজের হুমদো মুখ দেখছে। নেড়া হওয়ার পর নিজেকে চিনতে পারছে না, কী হবে এবার?

ভোলা এসে বলল, পেন্নাম হই পরামানিক, সোনামানিক, আমাদের সিং চাই।

হুকুম সিঙের চেলা?

কোলা বলল, ইয়াস।

বাপরে, ইংলিশ বলছে। নাপিত একটু সতর্ক হলো। ডাকাত এখন হিন্দি ছেড়ে ইংলিশ ধরছে? সে বলল, হুকুম চাই।

হুকুম সিং হুকুম যদি না দেয়?

ভোলার কথায় নাপিত বলে, হবে না হবে না।

তখন ভোলা আর কোলা রেগে গেল খুব। নাপিত যদি না দেয় সিং পাবে না কোনদিন। সিং না পেলে ডাকু হবে না। ডাকু ভোলা আর কোলা সিং বলে কেউ খাতির করবে না। রাগের চোটে তারা নাপিতকে তুলে নিয়ে চলল বনের ভিতর।

তারপর? ঠাকুমা জিজ্ঞেস করে। ইস ঠাকুমার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে গুগুলের গল্প শুনে। কী কাণ্ড! এতদিন ঠাকুমার কাছে গল্প শুনত গুগুল, এখন গুগুলের কাছে ঠাকুমা। বনের ভিতরে নাপিতকে নিয়ে গিয়ে ভোলা, বলল, সিং দো।

কোলা বলল, মুঝে দো, সিং দো পরামানিক ভাইয়া।

ভোলা বলল, সিং দো, সিং দো, পরামানিকজি।

নাপিত বসে থাকে। ভোলা কোলা তার উপরে গরম দেখায়। কিন্তু নাপিত করবে কী? সিং গজাবে কী করে? সিং ছাড়া কেউ ডাকাত হয় না, এমন আজব কথা কে শুনেছে কবে? কিন্তু বলেছে যে হুকুম সিং। সে যে তার সিং জমা রেখেছে পরামানিকের কাছে।

তারপর? উত্তেজনায় ঠাকুমা উঠে বসে।

গুগুল বলল, গুগুলে আছে।

কী আছে?

তারপর নাপিত কী করল। গুগুল বলে।

ঠাকমা মাথা নাড়ে, মোটেই নেই।

হি হি করে হাসে গুগুল। বলল, আছে আছে আছে, তুমি ঘুমোও আমি এখন আসি।

ঠাকুমা বলে, তুই আমার কাছে ঘুমো।

না, মার কাছে।

মার কাছে কেন আমার কাছে।

না মার কাছে। বলে খাট থেকে লাফ দিয়ে পড়ে গুগুল উধাও। ঠাকুমা কী আর করেন, মনে মনে গল্প নিয়ে অথৈ জলে পড়েন যেন। হুকুম সিঙের জমা রাখা সিং দেবে কী করে নাপিত। তখন বাইরে ঝিমঝিম ঝিম বৃষ্টি নামে।ঠাকমা ঘুমিয়ে পড়েন। গুগুলের আর পাত্তা নেই দুদিন। ঠাকুমার গল্পও আর এগোয় না। গুগুল জানে। কম্পিউটারের গুগুল নয়। এই বাড়ির ডাকাত গুগুল। তো ঠাকুমা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, আর গল্প হবে না। পত্রিকার লোক ফোন করছে বারেবারে। তখন গুগুল একদিন এল পা টিপে টিপে। মাথায় দুটো সিং। কালো কালো, মোষের সিঙের মতো বাঁকানো। হে হে হে হে, এই তো নাপিত দিয়েছে সিং।

দুটো মাত্তর সিং ছিল হুকুম সিং ডাকুর। ভাগ করে নাও তোমরা ভোলা কোলা। এক সিং ডাকাত তোমরা। বুঝলে ঠাম্মা? সমঝা, মেরা নাম হুকুম সিং, মেরা পাশ দো সিং, আর ভোলা কোলা দুই চেলা, তারা পেল এক সিং আর এক সিং।

ঠাকুমা তো অবাক। তাই তো রে তাই তো। নাপিত কোথায় পেল দুই সিং, ও গুগুল সোনা?

গুগুল বলে, বনের কাঠকুটো দিয়ে বসে বসে বানালো নাপিত, ভোলা কোলা তো শুধু ভোঁস ভোঁস করে ঘুমালো তখন।

তাতেই ওরা খুশি?

গুগুল নাচতে লাগল। বহুত খুশি আচ্ছা খুশি। বোকারাম ভোলা কোলা এক সিং ডাকাত হয়ে কী নাচ না নাচতে লাগল। কী গান না গাইতে লাগল। কেমন হয়েছে ঠাম্মা আমার দুই সিং?

ঠাকুমা বলেন, একেবারে হুকুম সিং, তার চেলা এক সিং দুই ডাকাত ভোলা কোলা, উফ, গুগুল আমার কত জানে, ঠাম্মা তার কাছে গল্প শোনে।

স্টিফেন হকিং এর চিঠি



শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং মহাশয়,

আমার নাম নীলাভ। ডাক নাম নীল। আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে আপনার কাছে। হ্যাঁ, আগে বলে নিই, আমার বয়স চোদ্দো। ক্লাস এইট। আমার দাদার কুড়ি। ফিজিক্স পড়ে। দাদার জন্মদিনে দাদাকে একটি বই দিয়েছিল বাবা – এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম-সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। দাদার কাছ থেকে নিয়ে বইটা আমিও পড়েছি। সবটা ধরতে পারিনি, কিন্তু পড়তে খুব ভাল লেগেছে। বুঝিনি সবটা বলেই কিছু কিছু প্রশ্ন জেগেছে আপনার লেখা ওই বইটি নিয়ে, বলা যায় সময় নিয়ে। তা রাখছি।

১) বড় হতে কত সময় লাগে স্যার?

২) আমার কাছে সময় সবসময় কম মনে হয় কেন? কারোর কারোর কাছে যে সময় আর ফুরোয় না, যেমন অভিরূপ। তার কথা পরে বলছি।

৩) স্যার অনেকের কাছে সময় অঢেল। আমি যখন সময়ের অভাবে হলদে পাখির পালক বইটা পড়তে বেশি সময় নিই। অনেকে সময় নেই, সময় বাড়ন্ত বলে ঘুমিয়ে কাটায়। ঘুমোতে গিয়ে সময় নষ্ট করে ফেলে।

স্যার অনেক লোকের যেমন টাকা থাকে না, সময়ও থাকে না। আমাদের ক্লাসের শুভময়রা হঠাৎ গরিব হয়ে গেছে। টাকা নেই ওর বাবার। এই যে ইস্কুল থেকে নিয়ে গেল হলদিয়া বন্দর দেখাতে, শুভময় যেতে পারল না। টাকা দিতে পারেনি তো। আমরা ফিরে এসে ওকে গল্প করেছি কী রকম টিফিন হলো, কী রকম লাঞ্চ হলো, বাস কোথায় কোথায় দাঁড়াল, কেমন দেখলাম ডক এই সব নিয়ে। কেমন দেখলাম বিদেশি জাহাজ, সেই সব নিয়ে। শুনতে শুনতে শুভময় যেন আমাদের কথা মুখস্থ করে ফেলল। পরে আমাকে বলল,দ্যাখ তোরা কেমন গেছিস কী দেখেছিস,সব আমি বলতে পারি, শুনবি।

আমার অবাক লাগে। সময় এক একজনের কাছে এক এক রকম। আমরা যে সময়ে হলদিয়া বন্দরে ছিলাম, শুভময় ঠিক সেই সময়ে ছিল বাড়িতে। ও খুব চেষ্টা করেছিল টাকা জোগাড় করতে। শেষ পর্যন্ত ওর বাবা দিতে পারেনি। বাবা যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করত তা বন্ধ হয়ে গেছে আচমকা। স্যার স্টিফেন হকিং আমরা সবাই মিলে যখন খুব আনন্দ করছি, ও তখন চুপচাপ বাড়িতে একা একা বসে। একই সময়, কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে তা দু'রকম কেন?

৪) স্যার স্টিফেন হকিং আর একটি ছেলের কথা বলি। তার নাম অভিরূপ। সেও হলদিয়া বন্দরে যায়নি। যেতে পারেনি, দুর্বল কি না। অভিরূপ প্রায়ই ইস্কুলে আসে না। ওর নাকি জ্বর হয়। আমরা যখন ইন্টার ক্লাস ফুটবল ম্যাচ খেলি, আমি লাল জার্সি গায়ে, শুভময় নীল জার্সি গায়ে, অরিত্র সবুজ জার্সি গায়ে, তখন অভিরূপ বসে থাকে মাঠের বাইরে। ওরও একটা টিম আছে। ক্লাস এইট। লাল জার্সি আছে। লাল জার্সি পরেই মাঠের ধারে বসে হাত নাড়ে। আমার ইস্কুলে যখন শীতের সময় স্পোর্টস হয়, একশো মিটার দুশো মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প – অভিরূপ কোনোটাতে নাম দেয় না। ওর না অসুখ। আমি যখন ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে গোল্ড মেডেল নিই, অভিরূপ ক্ষীণ গলায় চিৎকার করে ওঠে, হিপ হিপ হুররে। একই তো সময়, তা দুজনের ক্ষেত্রে দুরকম হবে কেন?

স্টিফেন হকিং স্যার, আপনি হুইল চেয়ারে বসে থাকেন। কথা বলতে পারেন না। আপনার মনের ভাষা যন্ত্র লিখে দেয়। যন্ত্র প্রকাশ করে দেয়। আপনি মহাকাশ সৌরমন্ডলের কথা ভাবেন। এই সৌরলোকের বাইরে যে অন্য সৌরলোক আছে তার কথা ভাবেন। তাদের চেনেন। আপনি কৃষ্ণগহ্বর চেনেন। মহাব্রহ্মাণ্ডে ওই বিন্দুই সব কিছু গ্রাস করে নেয় চারপাশ থেকে। ওই গহ্বরে প্রবেশ করলে সময় নাকি থেমে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে। সব কিছু বুঝতে না পেরেও শিহরণ লাগে হে মহাবিজ্ঞানী, আপনি আমার সামান্য প্রশ্ন কটির উত্তর দিলে বাধিত হবো। প্রণাম নেবেন।

২

প্রিয় নীলাভ,

নীলাভ শব্দটির অর্থ কী? আমি জেনেছি। আমার কম্পিউটার আমাকে সব জানিয়ে দেয়। নামটি ভারি সুন্দর। তোমার নামের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ হাজার হাজার নক্ষত্র নিয়ে জেগে ওঠে চোখের সামনে। কত নতুন তারার জন্ম হয়। কত তারার মৃত্যু হয় – এ সব আমরা চোখে দেখে ধরতে পারি না। সময় এক অপূর্ব ধারণা। শোনো যে নক্ষত্রটির আলো আজ রাত্রে পৃথিবীতে এসে পৌঁছল, সেই নক্ষত্রটির হয়ত বহু শত বৎসর আগে মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ আলোকবর্ষ পার হয়ে আসা তার আলো আজই দেখতে পেলাম আমরা। আমাদের কাছে সে জীবিত। তার মৃত্যুর আগেই ওই আলো যাত্রা করেছিল পৃথিবীর উদ্দেশে।

শোনো নীলাভ, সময়কে বুঝতে হবে নিজে নিজে। সময়ের আরম্ভ আছে, সময়ের শেষ নেই। প্রবাহিত হয়েই চলেছে তোমাদের পবিত্র নদী গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী, নর্মদার মতো। নদী তো সমুদ্রে মিশে যায়। সময়ও আর এক সমুদ্রে লীন হয়। সেই সমুদ্রটি খোঁজা এখনও বাকি। খুঁজছি। যদি অ্যান্টনি থাকত সে ঠিক খোঁজার পথটি বলে দিত। আন্টনির কথা পরে শুনবে।

তুমি এক চোদ্দ বছরের বালক। তুমি যে আমার বইটি পড়তে চেষ্টা করেছ, সময়কে বুঝতে চেয়েছে, তারপর কিছু প্রশ্ন জেগেছে তোমার ভিতরে তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। যে মানুষ প্রশ্ন করতে করতে বড় হয়, সে জানতে পারে অনেক কিছু।

প্রতিদিনই পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে অসংখ্য চিঠি আসে আমার কাছে। সবই প্রায় ই-মেল-এ। সেই সব ই-মেল-এর জবাব আমার সহকারীই দিয়ে দেন। একই প্রশ্নই তো সবাই করে। তোমার প্রশ্নগুলি একটু আলাদা। তাই আমিই জবাব দিলাম।

সময়কে বুঝতেও চাও বালক। বুঝতে পারবে, বড় হও। কেন একই সময়ে দু'জন দুরকম থাকে? বুঝতে পারবে, বড় হও। সময় আপেক্ষিক। সবার কাছে সমান হতে পারে না। তুমি তো প্রণম্য বিজ্ঞানী স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম শুনেছ। বড় হও। তাঁর কথা জানবে। তিনিও বুঝিয়ে দেবেন। আপেক্ষিকতাবাদ তো তাঁরই খুঁজে বের করা।

৩

প্রিয় বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং,

আপনার উত্তর আমি পেয়েছি। আমার বাবা বললেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি প্রশ্নগুলি নিয়ে ভেবেছেন। আপনি সৃষ্টিরহস্যের মুলে পৌঁছতে চাইছেন। রাতের আকাশের মতো বিপুল আপনার জ্ঞানের পরিধি, তবু আপনার জিজ্ঞাসা কিন্তু শেষ হবে না। আমার প্রশ্নও শেষ হয় নি। আপনি উত্তরগুলি দিলে বাধিত হবো।

১) অভিরূপ ইস্কুলে একদিন আসে, সাতদিন আবার আসে না। পড়াশুনোয় পিছিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। যেদিন আসে খুব গল্প করে। দক্ষিণ ভারত গিয়েছিল ডাক্তার দেখাতে। ভারত মহাসাগর দেখে এসেছে। শুভময় কোনদিন সমুদ্র দ্যাখেনি। বার বার জিজ্ঞেস করে সমুদ্র কত বড়? অভিরূপ বলে, আকাশ যত বড়, হয়তো তেমন, অসীম।

অভিরূপ বলে, বাড়িতে তার সময় আর কাটে না। সকাল থেকে সন্ধে হতে যেন বছর ঘুরে যায়। সময় অফুরন্ত। সে সারাদিন শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। ওদের ফ্ল্যাটটি সাততলায়। জানালা দিয়ে শুধু আকাশ দেখা যায়,আর দেখা যায় দুরের গাছপালা, বাড়ি। রাতে দেখা যায় আকাশের তারা, ছায়াপথ,দিনে দেখা যায় পাখির উড়াল আর ঘুড়ি। অভিরূপ খুব ঘুড়ির কথা বলে। তার খুব ইচ্ছে ঘুড়ি উড়ায়। লাল নীল সবুজ হলুদ রঙের ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ে লাটাই-এর সুতো ছেড়েই যায়।ঘুড়ি একটু একটু করে মহাকাশে পৌঁছে যাবে। পার হয়ে যাবে মহাকাশও।

স্যার কত লোক ঘুড়ি উড়ায়। কত ছেলেরা উড়ায়। আমাদের শুভময়ও উড়ায়। কিন্তু অভিরূপ উড়াতে পারে না। তার মা বলে, এখনো সময় হয়নি সোনা। কবে সময় হবে? সময় এত নিষ্ঠুর কেন? ঘুড়ি উড়ানোর সেই সময় লাল হলুদ সবুজ নীল রং মেখে কেন অভিরূপের কাছে আসে না?

আমাদের ওই বন্ধু শুভময় কত রকম ঘুড়ির নাম জানে।ঘুড়িতে ঘুড়িতে যুদ্ধের কথা বলে। আকাশে প্যাঁচ খেলা হয়। একটা ঘুড়ি কেটে যায়। শুভময় যখন ভো-মারা বলে চাপা চিৎকার করে ওঠে, তখন উত্তেজনায় অভিরূপের চোখে জল এসে যায়। সেও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে ওঠে, ভো-মারা।

স্যার অভিরূপ সেদিন এক আশ্চর্য কথা শোনাল। বলল, ঘুড়িরা কেটে গেলে আকাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় যায় জানো – ৫৮১ সি গ্রহে। সেই গ্রহ কোথায় জানো? এই সৌরজগতের বাইরে আর এক জগতে, এই গ্যালাক্সির বাইরে অন্য এক গ্যালাক্সিতে। গ্রহটি নাকি একেবারে পৃথিবীর মতো। তাপমাত্রা পৃথিবীর মতো হওয়ায় সেখানে মানুষ থাকলেও থাকতে পারে। অভিরূপ বলতে বলতে আচমকা হেসে উঠল, আরে শুনবি তোরা, সেখানে তেরো দিনে এক বছর। মানে তেরো দিনে গ্রহটি তার সূর্যকে পাক দেওয়া শেষ করে। বছর গিয়েই বছর আসে। হ্যাঁ, সেই পৃথিবীর যে সূর্য তার নাম গ্লিসে-৫৮১। আসলে সে একটি বামন নক্ষত্র, ডোয়ারফ স্টার। তার আলো লালচে। তাই নতুন পৃথিবীতে সেই লালচে আলোই এসে পড়ে। মনে হয় সব সময় বিকেল।

স্যার, অনেকদিন বাদে অভিরূপ এই নতুন গ্রহের কথা বলতে বলতে খুব হাসছিল। বলছিল, তার সময় কাটে না বাড়িতে শুয়ে থেকে থেকে, নতুন পৃথিবীতে তেরো দিনে যখন বছর, সময় ধরাই যাবে না। দুগগা পুজো কবে এল ধরাই যাবে না।অভিরূপ বলে, যদি ভবিষ্যতে এমন কিছু হয় যে মানুষ ওই গ্রহে বাস করতে গেল সেও চলে যাবে। ওখানে সময় তাড়াতাড়ি ফুরোয় তাড়াতাড়ি এসেও যায়, কম কথা!

এইসব কথা শুনতে শুনতে শুভময় একদিন আমার কাছে চাইল তোমার ওই বইটা।

বইটা যে আমি দেব, কী করে দেব? দাদার বই দাদা দিল না। বলল, দামি বই তো, না দিলেই ভালো।

‘এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম’ না পেয়ে শুভময়ের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সে খুব আশা করেছিল বইটা পাবে। আমি তখন বললাম, বাবাকে বল কিনে দেবে।

বাবা এখন পারবে না।

কেন পারবে না, বাবারা ওই রকম বলে!

না রে, বাবার ফ্যাক্টরি নাকি আর খুলবে না, আমার মা সেদিন কাঁদছিল আমাকে বুকে চেপে ধরে, আমাদের সময়টা এখন খুব খারাপ যাচ্ছে।

স্যার, একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না। সময়েরও ভালো মন্দ হয় কী করে? সময় কেন সবার কাছে সমান ভাবে আসে না। ভাল সময় মন্দ সময় – কী ভাবে সময় ভাগ হয়ে গেল ভালোমানুষ মন্দ মানুষের মতো?

২) স্যার, ওই যে অভিরূপ বলে সেই একটা ঘুড়ির কথা – মাঝ-আকাশে বাঁধন ছাড়া হয়ে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে এই মহাকাশ ছাড়িয়ে উড়তে উরতে অন্য সৌরমণ্ডলে গিয়ে পড়ল। তারপর খুঁজে পেল নতুন পৃথিবী ৫৮১-সি কে। ঢুকে পড়ল সেই পৃথিবীর আকাশে। তারপর নেমে পড়ল একটা মাঠের ভিতর। ঘুড়িও তো ক্লান্ত হয়। অভিরূপ বলে, মানুষের চেয়ে ঘুড়ি স্বাধীন, যখন সে কেটে যায়, বাঁধনহারা হয়ে যায়। মানুষের সময় কাটেই না, শুধু বিছানায় শুয়ে থাকো, ওষুধ খাও, ঘুম আসবে না তবু ঘুমোও। খোলা জানালা দিয়ে আকাশটা দেখা যায়। এক একদিন মেঘ হয়। ঘন মেঘ আকাশ ঢেকে ফেলে। সে যখন মেঘের দিকে চেয়ে ভাবে, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, তখন মা এসে জানালা বন্ধ করে দেন। জোলো বাতাসে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এখন এ সব দেখার সময় আসেনি।

স্যার কবে সময় আসবে? আমরা তো মেঘ দেখি, বারান্দায় বৃষ্টি এলে ভিজি। অভিরূপ তা পারে না। একদিন ইস্কুলে কী হলো, টিফিনের সময় কী মেঘ না করল, কী বাতাস বইল, তারপর বৃষ্টি ধেয়ে এল সৈন্যদলের মতো। শুভময় হো হো করতে করতে বৃষ্টির দিকে ছুটে গেল। জলে ভিজে ক্লাসে ফিরতে ওর শাস্তি হলো। একটা পিরিয়ড ক্লাসের বাইরে। ও পরে বলল, বৃষ্টির ভিতরে ছুটে যেতে কী ভালোই না লেগেছিল। তার জন্য একটু শাস্তি হলোই না হয়। অমন সময় তো সব সময় আসে না।

স্যার পৃথিবীতে যে যে সময় সুন্দর, সেই সেই সময় সবার কাছে থেকে যায় না কেন? ভাল সময় খারাপ সময় – সময় আলাদা হলো কী করে? স্যার আপনিই সব জানেন। সময়ের সব ইতিহাস। তাহলে বলুন স্যার, এসব কথার উত্তর দেওয়া আপনার কাছে কত সহজ।

৪

প্রিয় বন্ধু নীলাভ,

আমার বালক বন্ধু, তোমার ই-মেল আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার ওই বয়সে। মনে পড়ে যাচ্ছে কত কথা। মনে পড়ে যাচ্ছে আমার সহপাঠী অ্যান্টনির কথা। তার মা-বাবাও খুব গরীব ছিল। ওই বয়সেই তার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। সে জাহাজে খালাসির কাজ নিয়ে পূর্বদেশে যাত্রা করল। যে বন্দরে জাহাজ থামত সেখান থেকে আমাকে চিঠি লিখত। পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে তার মনে খুব কষ্ট ছিল। জাহাজে গিয়ে খুব মনমরা হয়ে ছিল ক'দিন। মা-বাবার জন্য, ইস্কুলের জন্য। গোপনে সে ক'দিন ধরে জাহাজের খোলে বসে কাঁদছিল। তখন এক বুড়ো নাবিকের চোখে পড়ল তা। সে তার হাত ধরে তুলে নিয়ে এল ডেকে। রাতের আকাশ দেখাল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে। তারা চেনাতে লাগল। বলল, এর চেয়ে বড় ইস্কুল আর নেই। সেই বৃদ্ধ নাবিক সমস্ত জীবন সমুদ্রে ভেসে ভেসে আকাশের যত তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ চিনেছিল একটু একটু করে। আকাশ দেখে, গ্রহ-তারা দেখে বিভোর হয়ে গেল অ্যান্টনি।

বালক বন্ধু নীলাভ, সময় যেমনই আসুক, তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিতে হবে। মনে করবে সমস্ত সময় রয়েছে মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। আমার সেই সহপাঠী অ্যান্টনি যদি মন খারাপ করে জাহাজের খোলে বসে থাকত, তাহলে আকাশ চেনা হতো? বন্দর থেকে যে চিঠি লিখত অ্যান্টনি,মনে আছে,তার ভিতরে থাকত সমুদ্রের ভিতর থেকে রাতের আকাশ দেখার অপূর্ব বর্ণনা। আকাশ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে কীভাবে নেমে এসেছে সমুদ্রের জলে, তা লিখেছিল অ্যান্টনি, মনে আছে। সে ছবি এঁকে এঁকে বছরের কোন সময়ে গ্রহগুলির কী অবস্থান তা বুঝিয়ে দিত আমাকে। কোন সময় কোন নক্ষত্র দেখা যায়, কোন সময় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়, তা লিখে দিত। তার চিঠি পড়েই আকাশকে চিনলাম আমি, আকাশকে দেখতে আরম্ভ করলাম। আকাশ আর সময়কে চিনতে চাইলাম।

আমার সেই বালক বন্ধু অ্যান্টনি জাহাজডুবিতে পূর্বসমুদ্রে মারা যায়। পূর্বসমুদ্র, বে-অফ-বেঙ্গল তো তোমার দেশে। অ্যান্টনিকে স্মরণ করো, সময়ের ভালোমন্দ,সময়ের বিপুলতা, সময়ের ক্ষুদ্রতা সব জেনে নিতে নিতে বড় হও। কবে যে বড় হয়ে যাবে তা তুমিও টের পাবে না, সময়ের এমনই খেলা।

৫

প্রিয় বন্ধু, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং,

আজ আপনাকে দুটি কথা বলব। অনেক দিন কেটে গেছে এর ভিতরে। বর্ষা শেষ হয়ে শরৎকালও চলে গেছে। এখন আমাদের দেশে হেমন্তকাল এসেছে। বেলা ছোট হয়ে গেছে, রাত্রিকাল হয়ে গেছে দীর্ঘ। আমার সহপাঠী, বন্ধু শুভময় ইস্কুল ছেড়ে চলে গেছে। তারা এখন দূর পশ্চিমে, নাগপুরে। সেখান থেকে সে চিঠি লেখে আমাকে। তার বাবা নতুন একটি চাকরী পেয়েছেন ওই দেশে। হ্যাঁ, সে কিনতে পেরেছে আপনার সেই বই, 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'। সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সব আমাকে চিঠিতে লিখেছে সে। লিখেছে সময় এখন আনন্দের। ভালো সময় এসেছে। তবে কষ্টের দিনগুলোর কথা সে ভুলবে না কোনোদিন। সময় চিনতে পারছে সে। আকাশে বাতাসে দিনে রাত্রে শীতে গ্রীষ্মে সময় বয়ে যায় বহমান এক নদীর মতো। তার উৎসে যেতে চায় সে।

প্রিয় বন্ধু, শেষ কথাটি বলি, অভিরূপ ৫৮১-সি গ্রহে বিকেলের লালচে রোদের পৃথিবীতে চলে গেছে। সে আর নেই। তার যে অত কঠিন অসুখ ছিল তা আমরা অতটা বুঝিনি। প্রিয় স্টিফেন হকিং, তুমি তো এই গ্যালাক্সি, এর বাইরের গ্যালাক্সি- অন্য ব্রহ্মাণ্ডের সব কথা জানো। আমাকে বলো দেখি নতুন পৃথিবীতে অভিরূপ কেমন আছে। তার অসুখ সেরে গেছে তো?

গাঙের ভূত



নৌকোর পিছনে লেগেছে ঠিক। এমন হয়, দিগ্বিদিক শূন্য অথৈ গাঙ, এই গাঙে সব সময় হা হুতাসী, হু হু বাতাস বয়েই যাচ্ছে। যে বাতাস বয়ে বেড়ায়, তা যে সব সময় নিরীহ, নির্দোষ সে কথা বলা যাবে না। ভালো বাতাস, মন্দ বাতাস, দুষ্ট বাতাস, পাগলা বাতাস...কত রকম বাতাস যে আছে। রোখন হলো জলদস্যু। গাঙের নৌকো, লঞ্চ, স্টিমার লুট করে তার আনন্দ। তবে হ্যাঁ, সে তার কাজ এমন নিঃশব্দে করে যে আজ পর্যন্ত তার হাতে একটি মানুষও মারা যায়নি। পিস্তল আছে, শূন্যে ভেসে ফেটে যাওয়া বোমা আছে তার কাছে। তাতেই সওদাগরী নৌকো কুপোকাত। আর আছে জলবোমা। জলে ফাটে। তাতে জলস্তম্ভ ওঠে অনেক উঁচু পর্যন্ত। জলবোমার তৈরি কৌশল তাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার ওস্তাদ হরি সর্দার। লোকটা বাঘের পেটে গেছে শোনা যায়। নৌকো নিয়ে বের হলো, তারপর ভ্যানিশ। কেউ কেউ বলে গাঙের তেনাদের কেউ, তা বাঘের ভূতও হতে পারে, শোধ নিয়েছে। সে নৌকো নিয়ে মধুতলা দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, বাঘের দ্বীপ থেকে বাঘ উড়ে এসে তাকে মুখে করে উড়ে গিয়েছিল গাঙের ভিতর। মধুতলায় বাঘ মেরেছিল নাকি হরি সর্দার তার জলবোমা দিয়ে। বাঘিনী সাঁতরে পেরিয়ে যাচ্ছিল এ দ্বীপ থেকে সে দ্বীপ। কতরকম কথাই না শোনা যায় বাতাসে। কিন্তু হরি সর্দার যে আর ফেরেনি, তা সত্যি। হুঁ, তার নৌকোর পিছু ধরেছে একটা বাতাস। গন্ধ পাচ্ছে রোখন। তার সাগরেদ বুনো মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করল, কিছু মনে হচ্ছে তোর, ও বুনো?

বুনোর মস্ত চেহারা। গায়ে খুব জোর। একটা আম কিংবা কাঁটাল গাছ পিঠে করে এ গাঁ থেকে সে গাঁ নিয়ে যেতে পারে। নৌকো মাথায় করে সাঁতরে পার হতে পারে হাসনাবাদের গাঙ। এই সব কথাও বাতাসে

ভাসে। বুনোর এমনি শক্তি, কিন্তু তাকে দিয়ে ফালতু কাজ করাতো তার গাঁয়ের সদানন্দ চক্কোত্তি, বামুন। বেড়া বেঁধে দে, কাঠ চেলা করে দে, আম গাছটা কেটে কাঠ গোলায় দিয়ে আয়। আর কাজে অন্যথা হলে কঞ্চির বাড়ি, এই হাত পাত, হাত পাত...। সদানন্দ হলো লিকলিকে একটা লোক, বুনো ফু দিলেই সে উড়ে যায় কিন্তু বুনো তাকে ভয় করত যমের মতো। একবার সদানন্দর বাগানের ফুল গাছ ছাগলে মুড়িয়ে খেয়েছিল, বুনোকে বৈশাখ মাসের খর রোদ্দুরে কান ধরে উঠবস করাচ্ছিল সদানন্দ ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে। রোখন গিয়েছিল তার মাসির বাড়ি মাসির মেয়ের বিয়ের নেমতন্ন খেতে। পথে দেখল একটা মস্ত চেহারার রাবনের মতো লোককে একটা লিকলিকে লোক উঠবস করাচ্ছে। লিকলিকে লোকটা তো ওই লোকটার কেড়ে আঙুলের মতোও নয়।ইস কী হেনস্থা। খুব খারাপ লেগেছিল রোখনের। সে দাঁড়িয়ে ছিল যতক্ষণ না শাস্তি শেষ হয়। অত রোদ্দুরে ওই লিকলিকে বামুন সদানন্দ যদি উঠবস করত, অজ্ঞান হয়ে যেত ঠিক। মরেই যেত কি না তার ঠিক নেই। কঞ্চির চেয়েও রোগা, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারে সদানন্দ। কী কাণ্ড একশো বার উঠবস করে লোকটা আবার কাঠ চেলা করতে লাগল কুড়ুল দিয়ে। একটু বিশ্রামও নিল না। কিছুই হয়নি যেন তার। গা মুছে নিল শুধু গামছায়। বুড়ো বামুন শাস্তি দিয়ে চলল তার মন্দিরের দিকে। তখন রোখন তাকে ডাকল, এই শুনে যা।

কী বলেন ছার। সে কুড়ুল হাতে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মস্ত দেহ। ঘামে চকচক করছে। গা শিউরে উঠেছিল রোখনের। সে তো জলের সর্দার। জলদস্যু। ডাঙায় এসে মনে হয় একেবারে দুবর্ল। সে সাহস করে বলেছিল, ওই লিকলিকে লোকটা তোকে উঠবস করাল কেন?

আঁজ্ঞে, ভালবেসে। খুব শান্ত গলায় বলেছিল সে, তারপর মিনমিনে গলায় বলেছিল, ছাগলে গাঁদার চারা মুড়িয়ে খেল যে,আমারই তো দোষ।

মুকখু, বেশ করেছে ছাগলে খেয়েছে, এই সাঁতার জানিস।

জানি ছার, সাঁতরে গাঙ পার হতি পারি।

নৌকোয় হাল ধরতে পারিস।

জানি ছার, বামুনবাবার জমি আছে আবাদে,সেই ভুতুয়াখালি দ্বীপে,আমি তো হাল বেয়ে নিয়ে যাই।

তখন রোখন সর্দার তার হাত ধরে বলেছিল, আমার সঙ্গে কাজ করবি?

কী কাজ? সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

জলদস্যু হবি? রোখন তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিল।

এই সেরেছে, পুলিসে ধরবে। সে চাপা গলায় বলে উঠেছিল, আর বামুনবাবার খুব অসুবিধে হবে, এত কাজ করবে কে?

আবার লোক রাখবে। রোখন বলেছিল।

ইনার বাগানে কেউ কাজ করতি চায় না, খুব খাটনি তো।

জলদস্যু রোখন বুঝেছিল লোকটা খুব সরল। লোকটাকে বিনি পয়সায় খাটায় বামুন। কোনো রকমে একে এখান থেকে তুলে নিতে পারলে এরই ভাল হবে। সে মাস বেতনে রাখবে। হাজার টাকা আর তিন বেলা খাওয়া। তাকে সমস্তটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। জলে থাকতে হবে। জলেই ডাকাতি করতে হবে। চোরাকারবারি নৌকো লুট করতে হবে। ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। তার এতবড় দেহ, গলায় কি জোর নেই? সে বলল, খুব আছে, কিন্তু বামুন ঠাকুর আস্তে কথা বলতে বলেছে, মিনমিন করে বলতে বলেছে, বামুনের বুক ধড়ফড় করে বলে সে আস্তে কথা বলে। একবার জোর গলায় কথা বলায় সাত ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে ছিল বামুনবাবা, তাই সে মিনমিন করে এখন।

তাহলে চ আমার সঙ্গে। তার হাত ধরেছিল রোখন।

সেই বুনো বসে আছে নৌকোর এক গলুইয়ে। অন্য দিকে রোখন। একটা বাতাস অনেকক্ষণ ধরে পাক দিচ্ছে। তারা ফিরছে হাসনাবাদ। হাসনাবাদে বুনো নেমে যাবে, রোখন যাবে নিজের বাড়ি গতখালি। সে

একটা দ্বীপ।

এখন জোয়ারের সময়।স্রোতের অনুকুলে চলেছে নৌকো।এবার বিশেষ কাজ হয়নি জলে বেরিয়ে। একটা ভুতুড়ে বাতাস যে পিছনে লেগে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে তা বুঝতে পারছিল রোখন। ফলে দলের লোককে নামাতে নামাতে সেও ফিরবে বাড়ি। আবার সাতদিন বাদে বদর বদর, পীরের নাম নিয়ে বেরোবে। হাসনাবাদ থেকে নেবে বুনোকে আগে। তার দলে পাঁচজন আছে মোট। বুনো বলল, ছার, ঠিক ধরেছেন, বাতাসই ভণ্ডুল করে দেছে সব, কেউ একটা আছে।

আছে? রোখন সর্দার জিজ্ঞেস করল উৎকণ্ঠিত হয়ে।

হ্যাঁ আছে। বলে নাক টানল বুনো।

তাহলে তোরে নামাব না, হাসনাবাদ যেতে হবে না, তুই গতকালই চ।

কেন ছার?

রোখন বলল, আমি একা ফিরতে পারব না বুনো, শীত শীত করছে।

বুনো বলল, তা তো করবেই, বাতাসই ঠাণ্ডা বরফ।

ঠাণ্ডা বরফ হবে কেন?

বুঝতেছ না ছার, বাতাস তো এমনি বাতাস না, হেই কেডা রে? বলে ওঠে বুনো মণ্ডল। তার গলার আওয়াজ কী? জল পযর্ন্ত চলকে ওঠে। এই যে আওয়াজ দিল, জল কেন, বাতাসও চুপ। সব কেমন থম থম করতে লাগল। বুনো আবার গলা খাঁকারি দিল, ক'দিন ধরে পিছনে পিছনে ঘুরতেছ তুমি, আমাদের কোনো কাজ হয় নাই, ধারে কাছে আসে নাই কেউ, উলটা বাতাস, ঘুন্নি বাতাসে আসবে কেন, আগে কেডা বলো, নইলে এমন রাম নাম ছাড়ব, অজ্ঞান হই যাবা।

তখন তিনি আবির্ভূত হলেন। মাঝ নৌকোয় এসে ভাসতে লাগলেন। কী ঠাণ্ডা গো। গলায় গামছা জড়িয়ে নিয়ে চোখ বুঁজল রোখন। ভয় করছে খুব। অথচ বুনোর ভয়ডর বলতে কিছু নেই, মাথা মোটা হুমদো। তেনাদের ভয় করবে না কেন?

বুনো বলল,এই ঠিক হয়ে বসো,আমার ছার খুব ভালো,আমারে বামুনের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে এনেছে, ভয় নেই, ছারের হিদয় খুব বড়।

আঁজ্ঞে হিদয় আমার মেজ কাকুর ছেলে, সোঁদরবনে মধু ভাঙতে গে ফেরেনি।

আরে ও হিদয় না, বুকিরি হিদয় বলে, লেখাপড়া নেই?

ছিল,জলে ডুবতি সব ভেসে গেল যে। খুনখুনে গলায় সে বলল। রোখন সর্দার বুঝল কথায় চন্দ্রবিন্দু লাগানো আছে। বোঝাই যাচ্ছে কে এসেছে।

বুনো জিজ্ঞেস করল, কী করে হলো?

আঁজ্ঞে তুফানে জাহাজ ডুবি হয়েছিল, তারপর থেকে গাঙে গাঙে ঘুরছি, দিশা পাচ্ছিনে, ডাঙায় যাব তো উপায় নেই, জলের ভিতর আমি ভেসে ভেসে মরে যাব।

মরার আর বাকি আছে কী, কিন্তু তুফান কবে হলো, কোথায় হলো, আমরা তো জানিনে। বুনো রোখনকে ডাক দিল, ও ছার ঘুমোয়ে পড়লেন নাকি?

না, এমনি। কোনো রকমে বলল রোখন, চোখ বন্ধই রেখেছে, তুই কথা বল।

তুফান কবে হলো, আমরা জানিনে কেন? বুনো জিজ্ঞেস করে।

চোখ পিটপিট করে রোখন দেখল নৌকোর মধ্যিখানে একটা অন্ধকারের স্তূপ। তার সঙ্গেই কথা বলছে বুনো। মূর্খ একটা। ভূত চেনে না। ভূতে ভয় পাবে না? আরে ভূতে যদি ভয় না পাস, তুই মানুষ হলি কেমনে?

না, ভয় পাবে কেন, আমি ঠাণ্ডাচরণ মল্লিক, ঠাণ্ডা মানুষই ছিলাম বলা যায়, জাহাজ ডুবি না হলে এতদিনে আমেরিকা চলে যেতাম, নেহাত বিপাকে পড়ে এয়েছি সাহস করে এই নৌকোয়।

যাহ বাবা, তার মনের কথা পড়ে নিয়ে বলে দিল! ঠাণ্ডাচরণ এর নাম। চোখ খুলেছে রোখন সর্দার, জিজ্ঞেস করল, জাহাজ আমেরিকা যাচ্ছিল?

ইয়েছ ছার। বলল ঠাণ্ডাচরণ।

তারপর? সাহস করে জিজ্ঞেস করল রোখন সর্দার।

অতলান্ত সাগরে তুফান হলো ছার, কী ঢেউ আর বিস্তি আর বাতাসের ঝাপটা।

সে সাগর কোথায়? জিজ্ঞেস করল রোখন।

আঁজ্ঞে,গাঙের পর গাঙ,তারপরে বড় গাঙ, তারও পরে আরো বড় গাঙ, তারপরে হবে কিংবা আরো পরে হবে পচ্ছিম দিকে যেতে হবে, সুয্যি ডোবার দেশ সে।

কী বলতেছ, সুয্যিডোবার দেশ? অবাক হয়ে যায় বুনো আর রোখন।

ইয়েছ ছার, সেই দেশেই সুয্য ডোবে। বলল ঠাণ্ডাচরণ।

বুনো বলল, ইস্কুলে পড়েছি সূয্যি ওঠার দেশের কথা।

হুঁ হুঁ, চা পান। বলল রোখন সর্দার।

বুনো বলল, না ছার জাপান।

ওই হলো, তুই জ বল আমি চ বলি। রোখন বলল।

ঠাণ্ডাচরণ বলল, সুয্যিডোবার দেশে যাওয়াই হলো বেপদ, না গেলে তুফান হতোনি, আমারে ডাঙায় দিয়ে এস বাবারা, আমি তোমাদের গোলাম হয়ে থাকব।

বুনো সর্দার বলল, তুই খুব ঠাণ্ডা।

হ্যাঁ ছার, মরার পর আরো হয়েছি, সুয্যিডোবার দেশে তো খুব ঠাণ্ডা, সিটাও ঢুকে গেছে আমার অন্ধকারে।

বুনো জিজ্ঞেস করল, তুই অন্ধকার?

ইয়েস ছার, অন্ধকার জমে জমে এই হয়েছি। বলল ঠাণ্ডাচরণ।

থাক বসে, আমরা হাসনাবাদের দিকে যাচ্ছি, তোরে সেখেনে নামাবো, আমিও নামব, ডাঙা পেয়ে যাবি। বুনো বলল। শুনে গা-পিত্তি জ্বলে গেল রোখন সর্দারের। জন্মের আগে থেকে তার ভূতের ভয়। ভূত সে একদম সহ্য করতে পারে না। ভূত নিয়ে হাসনাবাদ যেতে হবে। হা ভগবান। সে মনে মনে রাম নাম নিতে লাগল।

ছার খারাপ নাম নিওনি, কষ্ট হয় খুব, দম আঁটকে আসে। ঠাণ্ডাচরণ বলল।

এই কথায় বুনো বলল, হ্যাঁ ছার, উ নাম মনে এনেননি, ঠাণ্ডাচরণ মশায়ের কষ্ট হয়।

খুব রেগে গেল রোখন।কিন্তু ভূতের কথা অমান্য করার সাহস হলো না। সে রাবন রাবন বলতে লাগল মনে মনে। তাও বুঝতে পেরেছে ঠাণ্ডাচরণ। বলল, এইটে বলেন, খুব আরাম হয়, রাবন রাবন।

উফ! বুনো শুনে বলল, আমার ছারের বড় হিদয়, রাবন রাবন!

এখন বুঝতে পারছে বামুন কেন বুনোকে কান ধরে রোদের ভিতর উঠবস করাতো। বেশ করত। মুখ্যু। তোর মালিক কী চায় তা বুঝিসনে। এখনো হাসনাবাদ ঘন্টা তিন। ভুটভুট ভুটভুট করে বোট চলেছে তো চলেছে। ভুটভুট ভুটভুটকে মনে হচ্ছে ভূতভূত ভূতভূত।কী করে সে যাবে ভূতের সঙ্গে অতদূর। সে বলল, বুনো আমার গা কেমন করছে, এ কারে তুললি বোটে?

ঠাণ্ডাচরণ ঝিমোচ্ছিল, অন্ধকারের স্তূপ ঢেউয়ে দুলছিল। গাঙের ভূত ডাঙায় কেন যাবে?বুনো বলল, ইনি তো আছরয় নিছে, আমি কী করব ছার।

তখন রোখন সর্দার করবে কী? কালো বরফের মতো অন্ধকার জমা ভূতের দিকে তাকিয়ে তার ছয় ব্যাটারির টর্চ তাক করল। সুইচে আঙুল দিয়েছে তো ঠাণ্ডাচরণ টের পেয়েছে, কী করেন কী করেন ছার, মরে যাব।

বুনো বলল, না ছার না।

রোখন চুপ করে থাকল। কিন্তু আবার। টর্চ বের করেই দপ করে জ্বালিয়ে দিতেই গাঙ জুড়ে আর্তনাদ, এ কী করলেন ছার, উঁহু, কী কষ্ট, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি!

জমা অন্ধকারের দফারফা। ভূত ভ্যানিশ আলোর ভিতরে। কিন্তু টর্চ তো জ্বলে থাকতে পারে না। ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবে। তাই নেভাতে আবার বাতাস আরম্ভ হলো। সেই উথালপাথাল বাতাস। বুনো বলল, ছার এডা কী হলো, সে তো শুধু ডাঙায় যেতে চেয়েছিল, এমন করলেন কেন? চোখ মুছতে লাগল বুনো মণ্ডল। তখন রোখনের মনে হলো সত্যিই এটা কি ঠিক করেছে সে? অন্ধকার গাঙের দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল, রাবন রাবন, আয় আয়, ঠাণ্ডাচরণ ফিরে আয়।

বড় মানিক ছোট মানিক



এই গাঁয়ে দুই মানিক। একজন থাকে পুব দিকে, অন্যজন পশ্চিমে। উত্তরে মাঠ। মাঠ পেরিয়ে ঘাট। ঘাট মানে নদী। নদী পেরিয়ে আর এক গাঁ। আর দক্ষিণে জঙ্গল। সেই জঙ্গলে বাঘ আছে কেউ বলে। কেউ বলে বাঘ নয় গুলবাঘা। বাঘের মতোই বটে, তবে মানুষ দেখলে লুকোয়, হাঁস মুরগী টানে গেরস্তের ঘর থেকে। গুলবাঘা কেউ দেখেছে, কেউ দ্যাখেনি। যারা দেখেছে, বেশিরভাগই তাদের লেজ। মানে পালাচ্ছে। একজন দেখেছিল নাকি খুব ভোরবেলায়,সে গুণধর। গুণধর বলেছিল, তাকে দেখে নাকি কেঁদে ফেলেছিল গুলবাঘা। তারপরই দৌড় উলটো দিকে। যতক্ষণ দেখা গেল, সে শুধু কেঁদেই যাচ্ছে।

শুনে এক মানিক,বড় মানকে,যে থাকে পুব দিকে,সে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই কাঁদছিলে ভয়ে?

আমি না সে, বোধকরি বনের ভিতরে ঢুকে তার কান্না থেমেছিল।

ছোট মানকে মানে পশ্চিমে থাকে যে মানিক সে বলেছিল, সে কি তোমার দিকে তাকিয়ে পিছন পানে ছুটেছিল?

গুণধর রেগে গিয়েছিল, কিন্তু সে কি হেরে যাবার পাত্র বলেছিল, তাইই প্রায়, একবার কিছুটা যায়, আর ঘুরে তাকায় জলভরা চোখে।

বড় মানকে তখন বলেছিল, কেন তাকায়?

হে হে করে হাসে দুই মানকে, তারপর বলে, ভয়ে ফিরে তাকায়?

হ্যাঁ তাইই তাকিয়ে দেখছিল বারে বারে, ভীতু বাঘা। গুণধর বলেছিল।

বড় মানকে বলল, না তোকে চিনে নেওয়ার জন্য ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল।

গুণধর একটু ঘাবড়ে যায়। আসলে সে নিজেই খুব ভীতু মানুষ। কিন্তু দেখায় খুব সাহসী। গুলবাঘা সে দেখেছে কি দ্যাখেনি, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে দেখেছে। কেমন দেখেছে না অমনি দেখেছে। লেজ নয় মুখ। কান্নাভরা চোখে সে ফিরে ফিরে দেখছিল। কিন্তু দুই মানকে,বড় মানিক আর ছোট মানিক বলছে, না সে চিনে নিয়েছে গুণধরকে। দেখে নেবে।

গুণধর আমতা আমতা গলায় জিজ্ঞেস করল, দেখে নেবে মানে?

তোকে দেখে নেবে গুলবাঘা। বলল বড় মানকে।

এ কথার মানে কী ?

সাবধানে চলিস ফিরিস, গুলবাঘা ধরবে তোকে।

গুণধর বলল, কেন আমি কী করলাম?

সে তুই জানিস।

গুণধর চুপ করে পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে তাকায়। ইস! কেন যে সে গুল দিতে গেল বাঘা নিয়ে। এখন সত্যিই তো ভয় করছে। গুলবাঘা ফিরে ফিরে তাকাবে কেন? নিশ্চয় তাকে চিনে রাখতে। চিনে রাখবে কেন? নিশ্চয় তাকে দেখে নেবে। মানে তার ঘাড়ে থাবা বসাবে অতর্কিতে। কিন্তু গুলবাঘা কি সত্যিই দেখেছে সে? নাকি গুলবাঘা তাকে দেখেছে ঘুরে ঘুরে? সে তো বানিয়ে বলেছে। বানিয়ে বলা তার অভ্যেস। ভীতু গুণধর বুঝতে পারছিল না সে বানিয়ে বলেছে না সত্যিই ঘটনাটা ঘটেছিল ভোরবেলায়। ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। তখন আলো ফুটে গেছে। গরমে তো সাড়ে চারটেয় ফুটে যায় আলো। তাদের হাঁসের ঘরে হাঁসের ঘুম ভেঙেছে তখন। তার মনে হয়েছিল গুলবাঘা এসে থাকতে পারে। না কি সত্যিই এসেছিল বাঘের ছা। গুলবাঘা কিংবা ঝিঙেফুল বাঘ। গায়ে ফুল ফুল ছাপ। সাইজে ছোট। বাঘের বাচ্চা যেন। গুণধর আর ভোরে উঠবে না। কিন্তু তার তো ইস্কুল আছে। ক্লাস নাইন। ইস্কুলে বড় মানকে ক্লাস টেন। ছোট মানকে এইট। গুলবাঘা নিয়ে গুল মারায় ইস্কুলে রটে গেছে গুলবাঘা আসছে তাকে ধরতে। একা পেলেই ধরবে। বড় আর ছোট মানকে খুব সাহসী। রাতে শ্মশানে যেতেও তাদের ভয় নেই। বড় মানকে তো এর ভিতরেই দশটা শবদাহনে গেছে। ছোট মানকের দাদু মারা গেলে সারা রাত শ্মশানে ছিল। তার সাহসের কোনো তুলনা হয় না। গয়ে গুলবাঘা অয়ে অজগর, ভয়ে ভূত আর পয়ে পেত্নি কোনোটাতেই তার ভয় নেই। আর তার সঙ্গে আগানে বাগানে ঘুরে ঘুরে ছোটমানকেরও ভয়ডর কমে যাচ্ছে। ভয় বলতে একমাত্র চারুবাবু স্যার। অঙ্ক কষতে না পারলে, মধু মোড়া। দুই আঙুলের ভিতর পেনসিল ঢুকিয়ে আচ্ছা মোড়া। কিন্তু এতে বড় মানকের কিছু হয় না। সহ্য শক্তি খুব। ছোট আবার অঙ্ক ভালই পারে।

বোঝা গেল, কিন্তু তারপর কী হলো?

তারপর? ইস্কুল থেকে ফেরার সময় বড় মানকে বলল, এই তুই ঢিল মেরেছিলি গুলবাঘারে?

কে বলল? গুণধর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

জঙ্গলে রটে গেছে। ছোট মানকে বলল।

গুণধর জিজ্ঞেস করল, কে বলল?

কে আবার, গুলবাঘায়।

না তো। গুণধর বলে।

না বললে হবে, বনের সবাই জেনে গেছে ক্লাস নাইনের গুণধর ঢিল মেরেছে নিরীহ গুলবাঘারে, তারা শোধ নেবে, খুব সাবধান।

ছোট মানকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করে জানলে মানকেদা?

বড় মানকে বলল, বনে গিয়েছিলাম, প্রথমে বলল এক শজারু, তারপর বনবিড়াল, শেষে গুলবাঘা নিজেই।

গুণধর বলে, তুমি কী করে বুঝলে তারা কী বলছে, তারা কি কথা বলতেপারে?

গুণধরের প্রশ্ন কেমন নিরীহ মুখে সমর্থন জানায় ছোট মানকে, হ্যাঁ গো কী করে বুঝলে জন্তুর কথা, তারা কি মানুষের মতো কথা বলতে পারে?

বড় মানকে বলল,ময়না বলেছে,মানে শজারু, বনবিড়াল আর গুলবাঘার কথা ময়না টানসেশন করে বুঝিয়ে দিল, গুলবাঘার খুব লেগেছিল তাই চোখে জল এসে গিয়েছিল, চোখ মুছতে দাঁড়ায় আর পেছনে

তাকায়, গুণ তুই সত্যি কথাই বলেছিলি।
গুণধর বলল, আমি তো ঢিল ছুড়িনি।
তুই খুব মিথ্যে কথা বলিস, তোর খুব বিপদ।
গুণধর বলল, আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।
তাহলে গুলবাঘা কি মিথ্যে বলেছে?
গুণধর বলল, তা আমি জানি না, কিন্তু আমি ঢিল ছুড়িনি।
কিন্তু ইস্কুলে রটে গেল গুণধর কী করেছে। ঢিল মেরে গুলবাঘার পা ভেঙে দিয়েছে। তবে সেরেও উঠছে সে। বনের ভিতরে কবরেজি গাছ আছে। গুলবাঘা সেই গাছের পাতা পায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে ডালিম গাছের নিচে। ব্যথা কমছে। উঠল বলে। উঠে বন থেকে বেরোল বলে। বেরিয়ে গুণধরকে ধরল বলে। ধরে নিয়ে যাবে বনের ভিতর। বিচার হবেই হবে। গুলবাঘা খুব শান্ত প্রাণী। সাতে পাঁচে নয়ে ছয়ে থাকে না, শুধু খিদে পেলে বাইরে এসে হাঁসটা মুরগিটা নিয়ে যায়। তাকে ঢিল মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া কি ঠিক হয়েছে?
এই যে বললে পা?
তুই বল না পা না মাথা? বড় মানকে বলল।
গুণধর বলল, আমি মারিনি।
মেরেছিস কি মারিসনি সে গুলবাঘাই বলবে। বড় মানকে বলল, তোর খুব বিপদ।
হুম, তারপর কী হলো?
কী আবার হবে। গুণধরের ঘুম, গেল। স্বপ্ন দেখল, গুলবাঘা ওই এল। গুলবাঘা নয় শুধু ঝিঙে ফুল বাঘাও এল বুঝি। ঝিঙে ফুল বাঘা কেন শজারু, বনবিড়াল সব সারারাত্তির তার ঘরের বাইরে এসে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, গুণধর বেরোক, দেখে নেবে। বনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বিচার করে জেলে ভরে দেবে। পাতা আর কাঁটা দিয়ে ঘেরা জেলখানা। বেরোতে গেলেই কাঁটায় আঁটকে যাবে। ওই জেলখানা থেকে কেউ বেরোতে পারে না। ওখানে যাওয়া মানেই যাবজ্জীবন।
এসব কথা কে বলল? না সেই বড় মানকে ছোট মানকে। তারা সব খোঁজ রাখে। গুণধরের মনে হয় সব মিথ্যে। সে নিজে যেমন বানিয়ে বলে ফেঁসে গেছে, রাতের ঘুম গেছে তার, তেমনি ওরাও ওইসব বলেছে বানিয়ে, কিন্তু ফাঁসেনি। মনের আনন্দে ঘুমোচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে। ওদের ভয়ডর নেই। গুণধরের ভয় খুব। এমনি ভয় নিয়ে চলছিল। প্রত্যেকদিন ইস্কুলে নিজের টিফিনের ভাগ দিতে হয় একদিন ছোটকে, আর একদিন বড়কে। নিজের জন্য থাকে একটুখানি হালুয়া, এক পিস রুটি আর আধখানা সন্দেশ। কোনোদিন পুরো সন্দেশটাই বড় খেয়ে নেয়, শোন ময়নাকে আমি ফিট করেছি, সে বনের খবর নিয়ে আসে, সবদিন মিটিং চলছে, ওরা সন্ধে হলেই বেরিয়ে পড়বে যে কোনোদিন, দে সন্দেশটা দে, তুই কলা খা, জঙ্গলে কলা, আতা, নোনা, শাঁকালু... এই সব খেতে হবে তোকে।
হুঁ। গুণধর বলল, কাল থেকে আর সন্দেশ আনব না, কলা পেয়ারা, শসা, পেপে...।
না না না, আমি তো ওসব পছন্দ করি না, তুই বরং সন্দেশ, মুগের নাড়ু, বালুসাই, ক্ষীরকদম নিয়ে আসিস, ফল বলতে শাঁকালু ছাড়া আর কিছু না, বাকি ফল বনে গিয়ে খাবি।
গুণধর খুব রেগে যাচ্ছিল কিন্তু তার কিছু করার নেই। সে ভীতু আর বোকা। আর বানিয়ে কথা বলে। বলতে তার ভালোও লাগে। একবার তো বলেছিল জঙ্গল থেকে একটা হাতি এসেছিল। হাতি তাকে দেখে হাঁটু গেড়ে নমস্কার করে আবার বনে ফিরে গিয়েছে জঙ্গলের ভিতর। বসিরহাটে এক সার্কাস এসেছিল,তাতে হাতিকে সে দেখেছিল অমনি নমস্কার করতে। সেইটা সে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছিল। বড় মানকে সার্কাস দ্যাখেনি বসিরহাটে গিয়ে। তার তখন ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল।জ্বর ছাড়ে আর ধরে। ছোট যায়নি দেখতে, বড় জ্বরে বিছানায় পড়ে থাকলে সে যায় কী করে? গুণধরের গুলবাজিতে খুব রেগে গিয়েছিল দুই মানকে। কিন্তু কিছু করতে পারেনি। ম্যালেরিয়া ছিল যে। এইবার গুণধরকে বাগে পেয়েছে। ছাড়বে না। গুণধর না

গুলধর। গুলবাঘা তোকে টেনে নিয়ে যাবে জঙ্গলের ভিতরে। বিচার হবে। যাবজ্জীবন হবে। শুধু মানকে ঠেকিয়ে রেখেছে ময়না পাখিকে বলে। সন্দেশ আর রসকদম আনতেই হবে।

গুণধর গোঁয়ার গোবিন্দ। সে ঢিল ছোড়েনি, গুলবাঘাও দ্যাখেনি তবু তার বিচার হবে। গুল মারার বিচার। কিন্তু গুল তো দুই মানকেও বলে। তাদের তো বিচার হয় না। টিফিনের ভাগ দিতে হয় না।

বোঝা গেল। এখন কী উপায়?

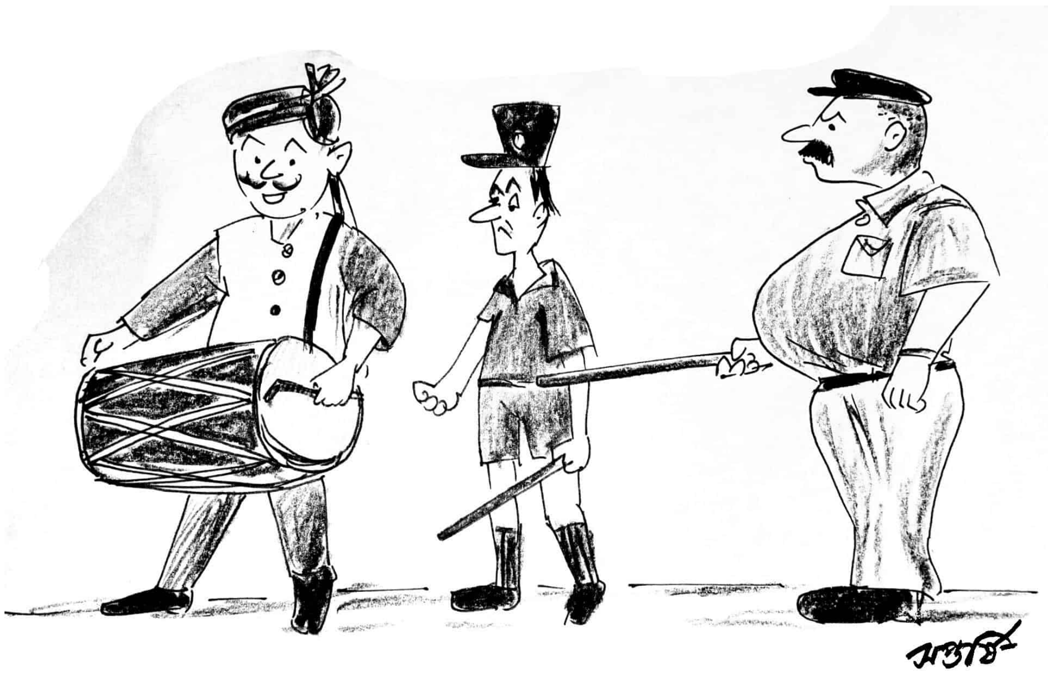
পরদিন গুণধর টিফিন বাক্স ধরে দিয়ে দিল কাঁদো কাঁদো মুখে। রাত্তিরে দুই বাঘা আর বনবিড়াল তার জানলার পাশে ফোঁস ফোঁস করছিল আর তাকে হুমকি মারছিল, আয় বেরিয়ে আয়, তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খাব, মানকেদা বাঁচাও।

কী টিফিন এনেছিস দেখি।

গোটা বাক্স ধরে দিয়ে দিল গুণধর। আর চোখ মুছতে লাগল। সন্দেশ আর রসকদম আর শাঁকালু। বাহ বাহ। আগে ফল পরে মিষ্টি। বনে রাঙা আলুও খেতে দেবে বিচারের সময়। শাঁকালুও। বনের শাঁকালু খুব ভালো। খুব টেস!গুণধরকে চোখের জলে ভাসিয়ে শাঁকালুতে কামড় দিল দুই মানকে। এক কামড়ে অনেকটা ভিতরে নিয়ে কচর মচর, মচর কচর...ওরে বাপরে এ কী শাঁকালু? বুনো কচু কেটেকুটে শাঁকালু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে গুণধর। আর তা খেয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে দুই মানিক। বড় মানিক আর ছোট মানিক। গুণধর কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাঘারা দিয়ে গেছে তোমাদের জন্য, তাই দিয়েছি, বনের আলু।

সেই যে বুনো কচু খেয়েছে দুই মানিক। সাতদিন লাগল গাল চুলকানি বন্ধ হতে আর ফুলো কমতে। গুণধরকে দেখলে তারা মুখ ঢাকে দুই হাতে। অন্য রাস্তায় যায়।

এখন তখন যখন সিং



একটা কথা মনে রাখতে হবে ডাকাতের মাথায় সিং না থাকুক, ডাকাতের নামের সঙ্গে সিং থাকবেই। লাখন সিং, মাখন সিং, যখন সিং, তখন সিং, এখন সিং, গগন সিং, মগন সিং, লগন সিং...এমনি সব সিং। তো ন'পাহাড়িতে এল যে সিং সেই সিঙের নাম যখন সিং। তার সাগরেদ তখন সিং। তখন সিঙের মাসতুতো ভাই এখন সিং। এখন ডাকাত তখন ডাকাত আর যখন ডাকাত। এখন, তখন আর যখন সিং তিন ডাকাত। এমন কথা এমন নামের হয় নাকি? হয় হয়, ন'পাহাড়িতে খবর নিলেই জানা যাবে তখন যখন আর এখন সিং কী করেছিল আর মোহন নিসপেক্টারই বা কী করেছিল। নিসপেক্টার হলো ইনসপেক্টার মোহন কুণ্ডু। ন'পাহাড়ি থানার দারোগাবাবু। তিনি খুব পেট রোগা মানুষ ছিলেন। কিছুই হজম হত না খেয়ে। জল খেলেও অম্বল হতো। অম্বল হলে খুব শীত করত। তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুতেন। এতে কী হতো, সব থানাতেই তিনি ব্যর্থ বলে নাম কিনেছিলেন। থানার বড়বাবু অম্বলে কাঁপে আর চোর ডাকাতে আপন মনে খেলে বেড়ায়। নিশীথের ধরাধরি, কবাডি, চু-কিত কিত। সেই সময় তিনি বদলি হলেন ন'পাহাড়িতে। আর এখানে এসেই তাঁর অম্বলের রোগ গেল।ন'পাহাড়ির জল ভালো। কথাটা তাঁকে বলেছিল ঢেকুয়া থানায় বদলি হয়ে আসা কনস্টবল চিটেরাম হল্লা। হল্লা তার নামে জুড়েছে। আসলে সে চিটেরাম চন্দ। কিন্তু বেজায় হল্লাবাজ বলে নামের পদবী বদলে গেছে। এমন হল্লাবাজ পুলিশ তুমি ভূভারতে পাবে না। কোনো তদন্তে গেলেই সে হল্লা পাকিয়ে দেয়। এমন চিৎকার চেচামেচি জোড়ে যে অপরাধী সব জেনে ফেলে নিশ্চিন্তে পান খেতে খেতে পালিয়ে যায়। তো সেই হল্লা যখন ঢেকুয়া এল, বলল, তার মনে হয় স্যারের অম্বল সারতে পারে ন'পাহাড়ি গেলে। সেখানকার জলের এমন গুণ যে পাথর খেলেও হজম হয়ে যায়। কী করে জানল সে এই কথা? সে তো ঢেকুয়া এল মহুলবনি থেকে। মহুলবনিতে হল্লা করে ঢেকুয়া। রোগা টিংটিঙে, মাথায় সজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া চুল। গোলগোল চোখ। লম্বায় ছফুট। সে বলল, তার মাসির বাড়ি ন'পাহাড়ি, কত গেছে সে। সে নিজেও চেষ্টা করছে ন'পাহাড়ি বদলি হতে, কিন্তু বারবার পিছলে যাচ্ছে।

কতবার হল্লা করে চোর ভাগিয়ে বদলি হয়েছে,কিন্তু ন'পাহাড়িতে হলো না একবারও। কিন্তু সে বদলি হবেই একবার। ওখানে যা খাও, হজম হবে। বাতাস কত ভাল, পড়লেই ঘুম। সে মাসির বাড়ি মাঝেমধ্যে যায় মাসির হাতের ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে আর আরামসে ঘুমোতে। হল্লাবাজের কথা শুনে মোহন কুণ্ডু অনেক ধরাধরি করে বদলি হলেন ন'পাহাড়ি।হল্লাবাজ চিটেরাম তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল হল্লা করতে করতে।

এই যে ন'পাহাড়ির নতুন স্যার এসেছে। এনার অম্বলের রোগ। এখেনে এসে অম্বলের রোগ সারবে নিশ্চিত। আর তা সারলে চোর ডাকাতের ঘুম কেড়ে নেবেন ইনি মোহন কুণ্ডু। যত সিং আছে, সব সিঙের সিং কেটে দিয়ে ইনি গারদে পুরবেন। শুনোভাই ডাকাত-চোর-গুণ্ডা-বদমাশ, আমাদের স্যার এসে গেছেন, এরপর আমিও আসব। তখন তোমাদের বিপদ। চিৎকার করে সব কথা বলে দিয়ে চিটেরাম হল্লা ঢেকুয়া চলে গেল দুপুর দুপুর। তখন বেলা গড়ালে এল একজন। বলল, আমি হল্লাদাদার মাসতুতো ভাই।

মাসতুতো ভাই, আহা এস বস, আগে এলে হল্লার সঙ্গে দেখা হতো।

মাসতুতো ভাই আবার চিটেরামের উলটো। ফিসফিস করে কথা বলা তার অভ্যেস। সামনে মাইক বসালেও কেউ সেই কথা শুনতে পাবে বলে মনে হয় না। সে বলল, স্যার, জল খান সাত গেলাস করে, সঙ্গে মুড়ি আর ভেলিগুড়, দেখবেন হজমের অসুখ ফুস।

তোমার নাম? মোহন কুণ্ডু জিজ্ঞেস করেন প্রথম গেলাস জল মুড়ির সঙ্গে চিবোতে চিবোতে। ভেলিগুড় আনতে পাঠিয়েছেন কনস্টবলকে দিয়ে।

আঁজ্ঞে আমি তো হল্লার মাসির ছেলে। সেই নিরীহ মতো, শাদামাটা লোকটি বলল।

মাসির ছেলের নাম কী?

আঁজ্ঞে সবাই তো মাসতুতো ভাই-ই বলে।

আরে তোমার নাম কী ?

ওই তো নাম। সেই লোকটি বলল।

ন'পাহাড়ি এসে দারোগা মোহন কুণ্ডুর অম্বল একদিনেই কমেছে। তবে কি না একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে। ঘুমোতে হবে। তবে ডিউটির সময় না। দারোগা তো। তদন্ত করা তাঁর অভ্যেস। সেই অভ্যেস ঢেকুয়া থানায় চলে গিয়েছিল প্রায়। আবার ফিরে আসছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নাম বলো।

সে চাপা গলায় বলল, ঐটেই নাম।

তিনি রুল ঘুরিয়ে বললেন, নেহি হোগা, বাড়ি যাও, নাম লিয়ে এস।

আচ্ছা স্যার আনব, আপনি চমচম ভালবাসেন, লাড্ডু?

রাগে পিত্তি জ্বলে গেল মোহন দারোগার,বললেন,না, তুমি কী করো হে?

আঁজ্ঞে কিছু না।

দারোগা বুঝলেন, এ খুব ঠ্যাঁটা লোক, বললেন, কিছু না মানে, কী?

মাসতুতো ভাই বলল,এমনি ঘুরি, গান গাই মাঠে বসে, চাঁদের আলোয় চমচম খাই, বর্ষার সময় খিচুড়ি খাই, শীতের সময় ফুলকপি, ফাল্গুনে নিমবেগুন, আষাঢ় মাসে ওলের ডালনা...।

উফফ, মাথা খারাপ করিয়ে দেবে এই মাসতুতো ভাই। চাঁদের আলোয় চমচম, কেন দিনের আলোয় হয় না?

কেন হবে না, দিনের আলোয়, মেঘলা দিনে, চমচম আর নকুলদানা।

বেশ,বেশ,বেশ!কিন্তু এর নাম কী, আর করে কী? সন্দেহজনক ব্যক্তিকে সন্দেহ করতে হয়। সন্দেহ করা দারোগার ধর্ম। হল্লা পুলিশের মাসির ছেলে হলেও সে বাদ যেতে পারে না। হল্লা পুলিশ চিটেরামের কেমন মাসির কেমন মাসতুতো? সোজা মাসি না বেঁকা মাসি? কেমন মাসি বল তো তুমি মাসির ছেলে?

সে বলল, ভাল মাসি, বয়স ধরুন পঞ্চাশ, লম্বায় চারফুট, মাথার চুল পাকা, মুখের ভিতরে দাঁত নেই, চোখে এখন চশমা পরে, মেসো বাড়ি ফেরে না অনেকদিন।

মেসো মানে তোমার বাবা?দারোগা জেরা করেন। উফ গায়ে বেশ জোর আসছে। অম্বল নেই। ভেলিগুড় এসে গেছে এক একটুখানি। দোকানে আর নেই। বাজারে সাপ্লাইও নেই। তা থেকে এক টুকরো শিলে ভেঙে মুখে দিয়ে চুষছেন তিনি জলের সঙ্গে। ভেলিগুড় এত শক্ত হয় কে জানত।

মাসতুতো ভাই বলে, আঁজ্ঞে আমার বাবা হবেন কেন, আমার মেসো।

হল্লার মাসি তোমার মা না?

আঁজ্ঞে আমার মা তো হল্লার মাসি, হল্লার মাও আমার মাসি।

উফফ, দারোগার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে হল্লার মেসো এই মাসতুতো ভাইয়ের বাবা হবে না কেন? শুনে চাপা গলায় হাসে সেই মাসির ছেলে, বলে, আঁজ্ঞে না, এ যেমন হল্লার মাসির ঘর, আমারও। আমি অন্য মাসির ছেলে। মাসি কি একটি হয়, অনেক হয়। মায়েরা পাঁচ বোন।

শুনতে শুনতে দারোগা বললেন, ঠিক আছে নাম বলো।

আঁজ্ঞে নাম তো ওই, মাসতুতো ভাই।

খামোশ। বলতে বলতে দারোগার চোখ জুড়িয়ে আসে। ভেলিগুড় মুখে দিয়ে ঘুম কেন পায়। তিনি বললেন, তুমি বাড়ি গিয়ে ইস্কুলের সার্টিফিকেট নিয়ে এস।

আজ্ঞে সেই ইস্কুল উঠে গেছে। ফিসফিসিয়ে বলে মাসতুতো ভাই।

তাহলে পঞ্চাতের সার্টিফিকেট আনো।

আচ্ছা স্যার, আনব।

এখন যাও। বলতে বলতে দারোগা মোহন কুণ্ডু ঘুমিয়ে পড়ল। আর একটু বাদেই হারে রে রে রে করে ডাকাতের দল এলাকার উপর দিয়ে বাজি ফাটাতে ফাটাতে চলে গেল। যাওয়ার পথে পথের ধারের নিম গাছে কোপ দিয়ে গেল। আম গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে গেল। মাটির হাড়ি-কলসির দোকানের সমস্ত কলসিতে লাঠির বাড়ি দিয়ে গেল। কুমোর কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল দারোগাবাড়ি, থানাবাড়ি। ও দারোগাবাবু, আমার কী হবে? আমার কী হবে, ভাঙা কলসি ভাঙা হাঁড়ি কি বেচা যাবে?

দারোগা তখন ভোঁস ভোঁস। মনটা আজ বেজায় খোস। অম্বল নেই কম্বল নেই। হজমিগুলি সঙ্গে নেই। ঘুমের ভিতর স্বপন নেই।

২

দারোগার ঘুম ভাঙল কুমোরের কান্নায়। কী হয়েছে, না এখন সিং আর তখন সিং, দুই ডাকাতে যখন সিঙের কথায় হা রে রে রে করে গেল। যাওয়ার পথে নিম গাছে কুড়ুল মারল, আম গাছের ডাল ভাঙল আর তার দোকানের হাঁড়ি ভাঙল হাটের ভিতর।

হাঁড়ি ভেঙে কী পেল ? দারোগা হাঁই তুলে বলল।

হাঁড়ির ভিতর জল ছিল, সেই জল গড়িয়ে গেল।

হুম, হাটে হাঁড়ি ভেঙে হলো কী?

হাঁড়ির সঙ্গে কলসিও গেল। কুমোর বলল, বড্ড দুষ্ট ডাকাত এখন, তখন আর যখন।

হুম, কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে করল কী? দারোগা জিজ্ঞেস করে।

বলে গেল মোহন দারোগার মাথায় ঘি। বলেই কুমোর জিভ কাটল, ডাকাতের কথা, আমার না।

হুম, এখন যখন তখন সিং, দেখছি আমি, করে কী?

আমার হাজার হাঁড়ি কলসি ভেঙেছে স্যার, কত যে লোকসান হলো?

দারোগা জিজ্ঞেস করে, দেখতে কেমন বল দেখি।

কুমোর বলে, কেউ লম্বা কেউ বেঁটে, কেউ ফর্শা কেউ কালো, তখন ছিল এক রকম, এখন হলো আর এক রকম।

দারোগা বলল, বুঝা গেল, কাল সকালে ব্যবস্থা হবে।

পরদিন দারোগা তিনবার মুগুর ভেজে,পাঁচবার ডন মেরে,সাতবার জগিং করে,ছোলা বাদাম আর সাত গেলাস জল খেয়ে থানার সিপাই নিয়ে বেরোল। ডাকাত ধরতে যাবে।সিপাইরা আগে আগে, দারোগা চলে পিছে। সবার আগে ঢোলক নিয়ে বাজনদার। দ্যাদাম দ্যাদাম, দ্যাম...ডাকুর শেষ, ঢাকুর ঢাকুর ঢ্যাম। যেতে যেতে ন'পাহাড়ি চক্কোর মেরে পাহাড়ি পথ যেই ধরেছে, মাসতুতো ভাই বেরিয়ে এল বন থেকে, দারোগা বাবু স্বাগতম, এক কুড়ি দুই চমচম।

দারোগা বলল, নাম কী?

মাসির ছেলে মাসতুতো ভাই, আর কী।

দারোগা বলে, সার্টিফিকেট?

পঞ্চায়েতে তাই বলেছে, এই দেখুন।

দারোগা বলল, পঞ্চায়েতকে ডাকো দেখি।

মাসির ছেলে বলে, আমিই সে, পঞ্চায়েত।

এদিকটায় বন আছে। নয় পাহাড়ের এক পাহাড় আছে। বনের ভিতর শিয়াল আছে। কচি বাঘা হুড়াল আছে। খরগোস আছে, শজারু আছে, বনের পাখি-টাখি আছে। দারোগা বলল, এখন সিং যখন সিং আর তখন সিং, তিন ডাকাতে গাছ ভেঙেছে, কুড়ুল মেরেছে, হাটের ভিতর হাঁড়ি ভেঙেছে, বলো তাদের পাবো কোথায়?

মাসতুতো ভাই বলল, এখন সিংকে যদিও পাবেন, তখন সিংকে তখন পাবেন, আর কখন পাবেন যখন সিংকে, যখন তাকে ধরা যাবে।

উফফফ, মাথায় সবটা ঢোকে না আর ধরে না। ধরে না তাই কখন যখন বোঝা যায় না। দারোগার খুব রাগ হলো, বলল, কথা সোজা বলো।

মাসতুতো ভাই বলল, তখন সিংকে দেখেছিলাম, যখন আবার দেখতে পাবো, দৌড়ে গিয়ে খবর দেব।

এখন সিং কোথায় গেল?

মাসতুতো ভাই বলে, বনের থেকে বেরিয়ে এল।

দলবল সব কোথায় গেল?

বনের ভিতর সেঁধিয়ে গেল।

দ্যাদাম দ্যাদাম দ্যাম,বন থেকে বেরুলো যখন, এখন তখন যখন ডাকু।

দারোগা বলল, উফ, চলো চমচম খাই, তারপর থানা ফেরত যাই।

হলো তাই। মাসির বাড়ি মাসি নাই। মাসতুতো ভাই বলে, মাসি মরেছে মেসোর শোকে, এখন সে একাই কাঁদে।

সাত চমচম খেয়ে, জল খেয়ে ঢেকুর তুলে, একটু ঝিমিয়ে দারোগা বলল, চলো এখন ফেরত যাই, থানায় গিয়ে ভেলি খাই।

তাই হলো।মাসতুতো ভাই আর দারোগা চলে আগে আগে, তার পিছনে সিপাই চলে, তার পিছনে ঢোলক বাজে। দ্যাদাম দ্যাদাম দ্যাম, যখন তখন আর ডাকাতি, হাটে হাঁড়ি আর কলসি, সঙ্গে কুঁজো, মাটির সরা, ভাঙলে পরে থানার হাজত, তিন নাস জেল এক মাস ফাঁসি।

ন'পাহাড়ির মানুষ অবাক। এমন কাণ্ড দ্যাখেনি তারা। যখন তখন ডাকাতের ভয়ে,সন্ধে হলেই বুকটা কাঁপে। দারোগা পুলিশ শুধু ঘুমায়, ডাকাত শুধু হারে করে। মোহন দারোগা বলে, মাসতুতো ভাই, চমচমটা আবার খাই।

মাসতুতো ভাই বলে,হল্লা পুলিশ যখন আসে,শাবন কিংবা ভাদর মাসে, চমচম আর লাড্ডু খেয়ে, দ্যাদাম দ্যাদাম শুধু নাচে।

ঢোলক বাজে, সিপাই হাঁটে। থানার পথে পা চলেছে। কুমোর পথে দাঁড়িয়ে ছিল। দারোগা তাকে ডেকে নিল। থানায় পৌঁছে মোহন দ্যাখে চিটেরাম হল্লা, খাচ্ছে দুটো কল্লা। মানে করলা। দারোগাকে দেখে মাটিতে গড় করল, বদলি হয়ে আসা গেল, স্যারের কত কেরামতি, স্যার ধরেছে ডাকাতি।

দারোগা তার চেয়ারে বসে বলল,হুকুম দিলাম, মাসতুতো ভাইকে জেলে নিলাম।

কী বলছেন স্যার? ফিসফিসিয়ে কথা বলা মাসির ছেলে তুলল গলা, চমচম খেলে মনে নাই, আমি তো এক মাসতুতো ভাই।

বলবে সব হল্লাবাজ,এই হল্লা বল দেখি,মাসির ছেলে হয় নাকি?

হল্লা হেসে বলল,মাসির কোনো ছেলে নেই,মাসতুতো ভাই আমার নেই।

মিথ্যেবাদি যুধিষ্টির,মাসির ছেলে মাসতুতো ভাই,এই ব্যাপারে ভুল নাই। বলে সেই মাসতুতো ভাই দাঁত কিড়মিড় করল। বলল,এখন মিথ্যে বলে পার পাবি, হল্লাবাজ, মাসির ছেলে, মারব তোরে হাঁড়ি ফেলে।

হল্লাবাজ বলল,যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, এখন আছে তখন নাই, যখন তখন ডাকাতি তাই।

এই হলো গল্প। এখন সিং ধরা পড়ায় ধরা গেল,যখন নেই,তখন নেই। হল্লাবাজের মাসির বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে মাসি আছে। সেই মাসিকে কে না চেনে। এই গঞ্জের নবম লেনে।

ভগবানের খেয়াল



একটা লোকের সঙ্গে আর একটা লোকের দেখা হলো পথের ধারে বটতলায়। গ্রামের নাম আমতলী। এই জায়গার নাম ছায়া বটতলী। আমতলীর ভিতরে বটতলী। আমগাছ যত বড় হোক, বটের মতো তো হয় না। বট ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে, অনেকটা জায়গা জুড়ে আমতলীর নান্টুবাবুর পিসির মতো থুপিয়ে বসে। হুঁ, সেই বুড়ি যে বসে থাকে তো বসেই থাকে। ঐটাই তার রোগ। কত কবরেজ দেখেছে তাকে, বলে গেছে ভগবানের মার। তিনিই যদি ইচ্ছে করেন, তাঁর যদি খেয়াল হয়, তবে সারতে পারে অসুখ।

একটা কথা বলে নিই, এই আমতলীর ভিতরে বটতলী পৃথিবীর নবম আশ্চর্যের দশম বলা যায়। সেই বটতলীতে একটা লোকের সঙ্গে আর একটা লোকের দেখা হলো। একটা লোক বেঁটে আর অন্য লোক? না, যা ভেবেছি তা নয়, আর একটা লোকও বেঁটে। তাদের একজন কালো, অন্য জন? হুঁ, সে ফর্শা হলেই আলাদা হতো, কিন্তু না, সেও কালো। বারমুডা প্যান্ট আর লাল গেঞ্জি দুজনেরই। দুজনের চোখেই নীল লাল চশমা। দুজনের পায়েই কালো বুটজুতো। বটতলীতে বটের ছায়ায় বসে একটা লোক আর একটা লোককে দেখছে। এই তোর নাম কীরে?

কেন লালচাঁদ।

আরিব্বাস আমার নামও যে লালচাঁদ।

ইস, বললেই হলো, আমার নাম আমার ঠাকমা দিয়েছিল।

তো, আমার কি দেয়নি?

একটা লোক দেখল তার মতো আর একটা লোক সামনে এসে বসেছে।একেবারে তার মতো।এ কখনো হয়,না হতে পারে? কিন্তু হয়েছে যে। এই তুই কী করিস?

বিজিনেস। অন্যজন উত্তর দিল।

আরিব্বাস, আমিও তো বিজিনেস করি।

কী বিজিনেস?

বলতে পারি, তুমি কাউরে বলবা না বলো।

বলব না। এক লালচাঁদ বলল।

মা কালীর কিরে?

হুম, মা কালীর কিরে।

সে হেসে বলল, আমি এখন আর কিছুই করিনে।

অন্য লালচাঁদ অবাক, আরে আমিও তো কিছুই করিনে।

কী অবাক করা কাণ্ড বলো। দুজনের সব মিলে যাচ্ছে। একেবারে অঙ্কের উত্তর মেলার মতো। দশে দশ। একশোয় একশো। কিন্তু এখন কিছু করে না মানে আগে কিছু করত কি? এই আগে কী করতে? এক লালচাঁদ জিজ্ঞেস করে অন্য লালচাঁদকে। অন্য লালচাঁদ বলে, ইছেমতী গাঙের ঢেউ গুনতাম।

যাহ বাবা, আমিও তো তাই করতাম, কত পেতে ঢেউ পিছু?

অন্য লালচাঁদ বলল, পেলামই না।

আমিও তো পাইনি।

ঢেউ পিছু এক পয়সা দেবে বলেছিল, কিন্তু...। কথা শেষ করে না লালচাঁদ।

তাই। দুই লালচাঁদই মনে করে একই কথা। তখন তার বাবা মরে গেছে। মা তো আগেই গেছে। একা দুঃখী লালচাঁদ বেরিয়ে পড়েছিল যদি কাজকম্মো কিছু পাওয়া যায়। বাবা মরে যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল, কাজকম্মো করে খা বাপ, তাই করতে হয়। গাঙ ধারে বসেছিল সে। তখন একটা লোক এল। লম্বা মতো। বলল, তুমি লালচাঁদ।

ইয়েস স্যার। লালচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল। ইস্কুলের অভ্যাস তো।

সিট ডাউন, এই লালচাঁদ, কাজ করবে? লোকটা জিজ্ঞেস করল।

ইয়েস স্যার, কাজ করতেই তো বেরিয়েছি। লালচাঁদ বলল।

তাহলে গাঙের ঢেউ গুণতে হবে, পারবে?

আঁজ্ঞে!লালচাঁদ অবাক।এইরকম কাজ হয়? হয়তো হয়। না হলে বলছে কেন?

ঢেউ পিছু এক পয়সা, লেগে পড়, এই খাতায় লিখে রাখ।

বাহ!বেশ তো।গাঙে ঢেউয়ের শেষ নেই।সে খাতায় চিকে দিতে লাগল। আচ্ছা ঢেউ গুণে কী হবে? লোকটা বলল, ভগবান বলেছে গুণতে।

ভগবান, সত্যি? লালচাঁদ কপালে বুকে হাত ঠেকালো।

ইয়েস সত্যি।

ভগবানের কিরে?

ইয়েস ভগবানের কিরে...।

লালচাঁদ জিজ্ঞেস করল, ভগবান ঢেউ গুণতে বলল কেন?

লোকটা বলল, ভগবানের খেয়াল।

তখন বিকেল হয়ে আসছে। লোকটা বসেছে কয়েক হাত দূরে। মাথায় অনেক চুল। তার মতো। বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছে সে। গরমের দিনে বিকেল বেলা গাঙের ধার খুব ভালো। কত হাওয়া। হাওয়ায় জল

ছলছল করছে। ঢেউ উঠছে আবার ঢেউ নামছে। ওই ওপারের মানুষ আবছা দেখা যাচ্ছে। ওপারটা নাকি অন্য দেশ। গাঙ পার হয়ে গেলেই ওদেশের পুলিশ ধরবে।আবার ওপার থেকে এপারে এলে এপারের পুলিশ ধরে।অথচ ওপারের লোক আর এপারের লোকে কোনো তফাৎ নেই। ওরা তাদের ভাষাতেই কথা বলে। তাদের মতোই পান্তাভাত লেবুপাতা দিয়ে ডলে শুকনো লঙ্কা মেখে খায়। গাঙে মাছ ধরে আবার ঢেউও গণে। সে লোকটাকে বলেছিল, ঢেউ তো অনেক।

হু,অনেক বলেই তো গুণতে হচ্ছে, একটা দুটো হলে কি একাজ করতে হতো? বলে লোকটা গাঙের দিকে তাকিয়ে বলল, এক পয়সায় একটা ঢেউ। ভোর থেকে সন্ধে অবধি। রাত্তিরে ছুটি। কি পারবে তো?

লালচাঁদ জিজ্ঞেস করল, ঢেউ গুণে কী হবে ভগবানের?

বললাম না খেয়াল।

এ কী রকম খেয়াল? লালচাঁদ জিজ্ঞেস করে।

সে তিনিই জানেন, তবে বিজিনেসও হবে।

লালচাঁদ বলল, ঢেউ দিয়ে বিজিনেস, না বিজিনেসের খেয়াল?

লোকটা বলল, তিনি খেয়ালি তো বটেই, খেয়ালি না হলে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটান।

তাইই। নাহলে গাঙের এপার এক দেশ, ওপার আর এক দেশ। দিন চলতে চলতে রাত এসে যায়। রাত চলতে চলতে ভোর হয়ে যায়। বাতাস দেখা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। ভগবানের খেয়ালে ঝড় হয়। বন্যা হয়। রেলগাড়ি উলটে পড়ে। মাটি কাঁপিয়ে ভূমিকম্প হয়। আবার বসন্ত কালে ফুল ফোটে, শীত কালে পাতা ঝরে। তাঁর যা খেয়াল হবে তাই করবেন। এখন মনে হয়েছে ঢেউ গুণে দেখতে হবে, তাই হবে, আবার ঢেউ দিয়ে বিজিনেস হবে, তো তাই হবে।

লালচাঁদ বলে, হুঁ, বুঝলাম, আমার পয়সা ঠিক মতো পাই যেন।

পাবে পাবে। বলতে বলতে লোকটা গাঙপাড়ে বাঁধা একটা ডিঙি নৌকোয় উঠে ভেসে গেল। লালচাঁদ পরদিন ভোর থেকে কাজে লেগে পড়ল। ঢেউয়ের পর ঢেউ। সে গুণে খাতায় লিখে রাখছে। তবে সে তো খুব চতুর, শেষের দিকে খাতায় আগডুম বাগডুম লিখে রাখতে লাগল। ধুর ভগবানের কি সাধ্য আছে কত ঢেউয়ে কত গাঙ হয়। সেদিন বেলা পড়লে আগের দিনের লোকটা এল, বলল, ভগবান পাঠালো, কত ঢেউ হলো?

অনেক।

অনেক মানে কত?

লালচাঁদ বলল, কয়েক হাজার।

ক'হাজার?

লালচাঁদ বলল, অনেক হাজার।

কত বল না।

পয়সা এনেছ?

পয়সা হবে, আগে হিশেব নিই লোকটা বলল।

লালচাঁদ জিজ্ঞেস করে, ঢেউ কখন বন্ধ হবে বলো দেখি।

লোকটা বলল, ভগবান বন্ধ করলে তো বন্ধ হবে।

লালচাঁদ অবাক হয়ে বলল, ভগবান ঢেউ দেন?

ইয়েস, তিনি গাঙের মুখে বসে ঢেউ দিচ্ছেন বলেই তো ঢেউ হচ্ছে।

লালচাঁদের মনে হলো তাহলে তো ভগবানের কাছে হিশেব আছে কত ঢেউ হচ্ছে গাঙে, তার ফাঁকিবাজি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু ভগবান যদি ঢেউ দেন,তাহলে অহেতুক এই ঢেউ গুণতে বসা কেন? তাঁর কাছে তো সব হিশেব আছে। তার প্রশ্নে লোকটা বলল, অঙ্ক করেছ পাটিগণিত, বীজগণিত?

ইস্কুলে ছিল।

উত্তর দেখতে করার পর?

লালচাঁদ বলল, আগেই দেখে নিয়ে বসিয়ে দিতাম, অঙ্কে আমি নম্বর পেতাম কম।

কত পেতে?

লালচাঁদ বলল, সে আর কী বলব, সব রাইট উত্তর, কিন্তু দশে এক, একশোয়ও এক, সঠিক উত্তর ঠিক লেখার জন্য।

লোকটা বলল, ভগবান হলো উত্তরমালা, ইস্কুলে যে ফাঁকি মেরেছ তার দাম দিতে হবে এখন, উত্তর দেখে বসাতে পারবে না, তোমাকে তোমার হিশেব দিতে হবে, বল কত গুণেছ, কড় গুণে বলো, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে বলো।

লালচাঁদ বলল, ভগবান যত ঢেউ দিয়েছে, আমি ততো গুণেছি।

কিন্তু তা কত?

চতুর লালচাঁদ বলেছে, সাত হাজার সাতশো সাতাত্তর।

লোকটা বলল, হয়নি।

কেন হয়নি?

ভগবানের হিশেবের সঙ্গে মেলেনি, উত্তরমালা না দেখলে তুমি ডাহা ফেল।

লালচাঁদ বলেছিল,মোটেই না, উত্তর মিলেছে, তুমি জান না।

লোকটা হে হে করে হেসেছিল, আমি জানব না তো তুমি জানবে।

ভগবান উত্তর বলে দিয়েছে? জিজ্ঞেস করেছিল লালচাঁদ।

আমি উত্তর মেলাতেই এসেছি। লোকটা বলেছিল।

তুমি কে গো,দাও না উত্তরটা,দেখে লিখে দিই, পয়সা ভাগ করে নেব।

লালচাঁদ,আমিই ভগবান।বলতে বলতে লোকটা নদীর অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। লালচাঁদ হতভম্ব। যাহ, বাবা! এই হলো ভগবান। ভগবানের মতো দেখতে নয় অথচ বলল ভগবান। মোটেই না। তার পয়সা মেরে দিয়ে উত্তর নিয়ে চলে গেল। অবশ্য উত্তরটা মিথ্যে। নিজের মতো বানিয়ে বলেছে লালচাঁদ। সে ঢেউ গোণা বন্ধ করে মুড়ি খেতে খেতে আমতলীর এই বটতলীতে এসে তার মতো আর একজনকে ভগবানের জন্য ঢেউ গোণার কথা বলল। শুনতে শুনতে অন্য লালচাঁদ বলল, একেবারে আমার গল্প।

তোমারও এই হয়েছে? লালচাঁদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ইয়েস,কিন্তু যে লোকটা ঢেউ গোণাতে এসেছিল, সে একেবারে তোমার মতো। তাই তো ভাবছি এত চেনা চেনা লাগছে কেন?

ইস, আমি কি না ফালতু ঢেউ গুণে এক পয়সাও পেলাম না, আর বলছ আমি তার মতো, বরং তুমিই অবিকল সেই লোক।

মোটেই না, আমি লালচাঁদ।

না,তুমি সেই সেই ভগবানের লোক, খাটিয়ে নিয়ে একপয়সাও দাওনি।

আমি কেন হবো, আমি তো ঢেউ গুণে গুণে হদ্দ হয়ে গেছি। বলে সেই লালচাঁদ এই লালচাঁদের দিকে এগিয়ে এল, বলল, ঠিক সেই লোক, এবার কী, গুণতে না মাপতে বলবে, ছায়া মাপব না গাছের পাতা গুণব?

আমিও বলি, কী করব বল, ঘাস গুণব না মেঘ মাপব আকাশে?

অন্য লালচাঁদ বলে, আমার হিশেবের পয়সা দাও, খাটনির পয়সা, ভগবানের নাম করে খাটিয়ে নিলে আমাকে।

লেগে গেল দুই লালচাঁদে। লড়াই। এ ওকে তুলে আছাড় দেয় তো ও একে তুলে ছুড়ে ফেলে। উফ, সে কী ভীষণ লড়াই। ধুলো উড়তে লাগল। গাছের পাতা কাঁপতে লাগল, ঝড় হতে লাগল। পাখিরা সব কিচিরমিচির করতে করতে ডানা ঝাপটে পালিয়ে গেল। গরু মোষ লেজ তুলে মাঠের দিকে দৌড়ে গেল ভয়ে। লড়াই চলল সারাদিন। বেলা পড়তে লড়াই করতে করতে দুই লালচাঁদ অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল বটের ছায়ার বাইরে। তারপর দেখা গেল একটি উঠে বসেছে। উঠে অন্যটির দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, শুয়ে থাক লালচাঁদ, আমি যাই, আমিই ভগবান, তোমারে আগে বলিনি।

যে লালচাঁদ শুয়ে ছিল সেও তৎক্ষণাৎ উঠে বসে, ইস, তুই ভগবান না মুই ভগবান।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দুজনেই হি হি করে হেসে কুটিপাটি। একজন অন্যজনের দিকে আঙুল তুলল, বলল, তুই ভগবান মুই জানি।

অন্যজন হেসে বলল, না তুই ভগবান মুই জানি।

মুই না তুই...মুই না তুই...কথা চলতে লাগল। দুজনেই লালচাঁদ হলে হবে কী, দুজনের মতে মিল হয় না একটুও যে তা বুঝতে পারল দুই জনাতেই। বুঝতে পেরে হাত বাড়াল, বুক বাড়াল, এই লালচাঁদ আয় দেখি।

তারপর? দুজনে হিংসা ভুলে গলা জড়াজড়ি করে লালচাঁদ ভগবান হয়ে বটের তলার অন্ধকার ছেড়ে মাঠের ভিতরে নামল। তারা দুজনেই নাকি ভগবান, জেনেছে এই মাত্র, ঝগড়া করতে করতে। মুই না তুই করতে করতে। হ্যাঁ, দুজনের ভিতরেই ভগবান আছেন। সন্ধে নামল, আকাশ তারায় তারায় ভরে উঠল।তারা দুজনে সেই অবারিত প্রান্তরে হাওয়ায় ডুবে অন্ধকারে তারার আলোয় বসে তারা গুণতে লাগল। এমনি। ভগবানের খেয়াল। তারা তারা গুণতে গুণতে বাতাসে যেন বৈঠা মারতে লাগল হাত দিয়ে। আর তখন গাঙে ঢেউ ভাঙতে লাগল, তারার আলো ঢেউয়ের উপর নাচানাচি করতে লাগল। আর নান্টুবাবুর পিসি, যে কিনা বটের মতো থুপিয়ে বসে থাকে সারাদিন, এমন রোগের কোনো দাওয়াই নেই বলে, সে উঠে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে যাত্রা করল। একা একা। কেন তা সেই বুড়িও জানে না। কিন্তু তার কোমর ছেড়েছে সত্যি। ভগবানের খেয়াল।

খলসেখালির পুঁটিরাম



খলসেখালির পুঁটিরাম মল্লিককে চেনে না এমন লোক খলসেখালিতে নেই। আহা খলসেখালি হবে কেন মাগুরখালি, কইখালি, ট্যাংরাখালি, চুনোখালি, আশপাশের সাত গ্রামের কে না শুনেছে দিল্লি ফেরত পুঁটিরাম মল্লিকের নাম! তিনি খলসেখালি থাকেন। তাঁদের সাতমহলা ভুতের বাড়িতে একা। খলসেখালির লোক বলে, তাঁর তিনটি পোষা ভূত আছে। একজনে রান্না করে। জামা কাপড় কাচে।আর একজন জমি চষে। শেষের জন ফাই ফরমাস খাটে। ফাই ফরমাস মানে দোকান-পাট করা, হাট-বাজারে যাওয়া ইত্যাদি। পুঁটিরাম ভূত খাটিয়ে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে আয়েশ করে। খলসেখালির বড় দোকানদার ধনঞ্জয় সামন্ত বলে, পরে টের পেয়েছে তারা ভূত,তার দোকানে এক একদিন, এক একজন আসে। দিনে নয় সন্ধের পর। তাকে এই গ্রামে দ্যাখেনি সে কোনদিন। সর্ষের তেল, চিনি, মুসুর ডাল, আটা ময়দা এইসব কিনে নিয়ে যায়।

কেমন চেহারা? সত্য হাজরা জিজ্ঞেস করে।

বলছি দাঁড়াও, একটু কাজ মিটিয়ে নিই। ধনঞ্জয় সামন্ত এক কেজি চিনি ওজন করতে করতে উত্তর দেয়। সে খুব খুঁতখুঁতে। ওজন যেন এক গ্রাম বেশি না হয়, আবার সিকি গ্রাম কমও না হয়। ফলে ওজন করতেই তার সময় যায়। ওজন করে সে আনন্দ পায়। ওজন করতে করতে সে পুঁটিরামের বিবরণ দেয়, তাও একেবারে নিক্তিতে নিক্তিতে ওজন করে। কমও হবে না, বেশিও না।

পুঁটিরাম বহুদিন নাকি দিল্লি ছিল। ফলে খলসেখালি গ্রামে তার দাম অনেক বেশি। সে কী না জানে? পুঁটিরামই তো প্রথম জানালো, দিল্লি কা লাড্ডু আসলে ভেলি গুড় আর মটর ডাল দিয়ে তৈরি হয়। টকে

ভরা। খাইলেই পস্তাতে হবে।আবার না খাইলেও তাই। পুঁটিরাম চিমসে রোগা, দিল্লি থেকে গোলগাল মোটাসোটা হয়ে ফিরেছে। মাথা ভর্তি চুল, পান খেয়ে লাল হয়ে যাওয়া দাঁত, পায়ে নাগরাই, পুঁটিরাম মল্লিক মায়ের মৃত্যুর পর বাড়িতে তালাচাবি মেরে দিল্লি চলে গিয়েছিল ভাগ্য ফেরাতে। বাবা ছিল না। সেই পুঁটিরাম পনের বছর বাদে দিল্লি থেকে ফিরেছে হঠাৎ। ফিরে দিল্লির গল্প করে শুধু। পুঁটিরামের কথা শোনাতে শোনাতে ধনঞ্জয় বলে, মুখ ঢাকা, চোখ দেখা যায় শুধু।

কার মুখ ঢাকা, চোখ দেখা যায়? সত্য হাজরা জিজ্ঞেস করে। খলসে খালির সত্য হাজরা খুব ঝগড়ুটে মানুষ। সবার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধানো তার অভ্যেস। কিন্তু ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সে ঝগড়া করে না বড় একটা। তাহলে এখানে বসে তার ছোট ভাই নিরীহ, ভালো মানুষ নিত্যহরির সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে পারবে না। ধারে বিস্কুট লজেন্স খেতে পারবে না। সত্যর কথার উত্তর দেয় ধনঞ্জয় একটু দেরি করে। খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে। এক গ্রাম কম বেশি হচ্ছে অনেকক্ষণ। সেই সমস্যার সমাধান করতেই টাইম গেল। এরপর কর্মচারী ভুতোকে দায়িত্ব দিয়ে ধনঞ্জয় মন দিল পুঁটিরামের কথায়। সত্য শুনতে শুনতে বলে, তাহলে একদিন সন্ধেয় আসতে হয়, দেখতে হবে কেমন ভূত।

আরে তুমি ভূতের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করবে নাকি?ধনঞ্জয় উদ্বিগ্ন গলায় বলে।

দোষ করলে তো বলবই, ছেড়ে দেব না। সত্যহরি বলল।

না না, ভূতটুতে আমার একটু সমস্যা হয়, তার উপর খদ্দের বটে, শুনেছি, মানে পুঁটিরাম বলে, দিল্লির লাল কেল্লার ওখানে অনেক ভূত আছে, ভূত দিল্লিতে অনেক কাজ করে দেয়।ধনঞ্জয় বলে।

অনুচরগুলো কি সেখেন থেকে ধরে আনা? সত্য জিজ্ঞেস করে।

তাইইই হবে। ধনঞ্জয় বলে, কথায় চন্দ্রবিন্দু বসান, চিঁনি আঁছে গোঁ।

সত্যহরি বলে, মুখে টর্চ মের না খবদ্দার, তেনারা রাগলে খুব খারাপ, তা আমি জানি, তবে মুখে আমার সঙ্গে পারবে না, যতই চন্দ্রবিন্দু মারুক কথার ভিতরে।

ওসব করলে দোকানের নয়, কত শান্ত তাঁরা, তিনি এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মাসকাবারি ফর্দ ধরিয়ে দেবেন,তিরিশ কেজি চাল, কুড়ি কেজি আটা, আট কেজি সর্ষের তেল, সাত কেজি চিনি...। একটু বাড়িয়ে বলল ধনঞ্জয়। এ তার অভ্যেস। বাড়িয়ে বললে বিক্রি বেশি দেখান যায়। তাতে দোকান এবং তার মর্যাদা বাড়ে।

পুঁটিরাম মল্লিকের বাড়ির বাজার? সত্য জিজ্ঞেস করে।

তা ছাড়া আর কার? ধনঞ্জয় বলে।

একজন এক মাসে অত খায়? সত্যহরি বলে, ভূতের খাঁই কি বেশি, আমি তো জানি এক পোয়া কাঁচা মাছেই তেনারা দিন কাবার করে দেন।

তখন দিল্লি ফেরত পুঁটিরামের আবির্ভাব হয় ধনঞ্জয়ের দোকানে। সে এসে বলে, সত্যহরি, তুমি কিসুই জান না, ওদিকে লোক মছলি খায় না, তেনারাও না, তাই তাদের নিয়ে এমন কথা বলবে না যে তাদের মানে লাগে, নিরিমিষি সবাই, কাঁচা মাছ খাবে কেন? গায়ে পড়ে কোঁদল করবে না, আর ভূত কইবে না, ভূত বলে কি যা খুশি বলা যায়, এদের ভিতর সুখবীর ভি আছে।

কে সুখবীর? সত্যহরি জিজ্ঞেস করল।

সুখবীর কে? না সে ছিল দিল্লির সব চেয়ে বড় পালোয়ান। শুধু ব্যায়াম করে আর ওজন তুলেই লাখ লাখ টাকা আয় করত। স্যাঙাৎ ছিল পুঁটিরাম মল্লিকের। এমনই স্যাঙাৎ যে মরে গিয়েও তার সঙ্গে আছে। ডেইলি ব্যায়াম করে আর ওজন তোলে, মাসল দেখায়।

শুনতে শুনতে সত্যহরি খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, সে কেমন খায়, ভাত রুটিতেই চলে?

চলে,পালোয়ান ভূত,বডি রাখতে হবে তো। শুনবে সুখবীর কেমন খায়? কেমন খেত?

ধনঞ্জয় সামন্ত জিজ্ঞেস করে, মন মন ভাত রুটি নিশ্চয় ?

এই এক কেজি আটা, হাফ কেজি ময়দা, হাফ কেজি চিনি, আড়াই কেজি চাল...।

প্রত্যেক দিন এত লাগুত? ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করে।

পুঁটিরাম মাথা নাড়ে, না, এক মাসে।

পালোয়ান এইটুকু খেত এক মাসে?

হ্যাঁ, পুঁটিরাম হাসে, বলে, দিল্লি কা লাড্ডু ডেইলি পঁচিশটা, আর ছোলা এক মাসে এক কুইন্টাল।

হে হে হে।ধনঞ্জয় সামন্ত হাসে, বলে, তাই বলো, এক কুইন্টাল ছোলা।

হ্যাঁ, পিষে ছাতু বানিয়ে বেচত পালোয়ান। বলে পুঁটিরাম পা নাচায়, ওইটাই ছিল তার বিজিনেস। বলতে বলতে পুঁটিরাম ওঠে, তার একটু দরকার আছে পোস্টাপিসে। দিল্লি থেকে চিঠি আসবে। এল কি না খোঁজ নেবে। সে চলে যেতেই সত্যহরি বলে, পুঁটিরাম মল্লিকের বাড়ি যাবে সে, দিল্লি ফেরত পুঁটিরাম মল্লিকের অনুচরদের খোঁজ নেবে। রাম কোঁদল লাগিয়ে দেবে। ভূতের সঙ্গে ঝগড়া করা তার বহুদিনের সাধ। শুনে ধনঞ্জয় এবং তাঁর দোকানের কর্মচারী ভুতো বলে ওঠে, কী দরকার, উনি আছেন ওঁর মতো, খোঁজ নিতে হবে কেন, তারপর ভূত নিয়ে তোমার কাজ কী?

সত্যহরি বলে, তাই বললে হয়, ভূত বলে কি ভয় করে চলতে হবে নাকি?

এই তোমার দোষ সত্য, তারা আছে তাদের মতো, পালোয়ান ভূত একজনা, তাদের বিরক্ত করা কেন? ধনঞ্জয় বলে। এই রকম কথা হয় যখন তখন দিনের বেলা। চারদিকে ঝমঝমে আলো। রাতে গ্রামের ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে বটে, কিন্তু ভোল্টেজ খুব কম। নিজের হাত নিজে দেখতেও চশমা লাগে। ধনঞ্জয় বলে, অত জিনিশ নাকি একটা থলেতে ভরে লোকটা অন্ধকারে মিশে যায়। একটা ছোট থলেয় তিরিশ কেজি চাল, তিরিশ কেজি আটা, ময়দা...। সব ধরেও নাকি জায়গা থাকে। শুনতে শুনতে সত্যহরি বলে, সে রাত্তিরে আসবে, এসব সে অনেক দেখেছে, গোবর পালোয়ান দুই হাতেই দুই কুইন্টাল তুলতে পারত, সে লোহা হোক আর তুলো হোক, তার চেয়ে বেশি পালোয়ান নাকি দিল্লির ভূত?

ভুতো জিজ্ঞেস করে, এক কুইন্টাল তুলোর ভার বেশি, না লোহার?

ধনঞ্জয় বলে, তুলোর ভার বেশিই হবে, নিক্তিতে সমান করে ওজন করো, তাইই দেখাবে।

ইস, আমার মনে হয় লোহার ভার বেশি। সত্যহরি বলে।

এই কথার ভিতরে আবার পুঁটিরাম এসে গেল। পুঁটিরাম এমনি। শুধু আনাগোনা করে। স্থির হয়ে বসতে পারে না। সেই জন্যই তো দিল্লি থেকে পনের বছর বাদে ফিরে এল। পোস্টাপিস থেকে ফিরে এল। পোস্ট মাস্টার বলেছিল, খুঁজে দেখবে, একটু বসতে হবে। সে আর বসেনি। অত সময় তার নেই। তার চিঠি আসেনি। আসবে। এলেই সে তিন অনুচর নিয়ে দিল্লি ফিরে যাবে। সে তুলো আর লোহার খবর খুব জানে, পুঁটিরাম মাথা নাড়ে, বলে, মস্ত বস্তা লাগবে এক কুইন্টাল তুলোর জন্য, লোহা তো একটা থলেয় ধরে যায়, সুখবীর পালোয়ান ফু দিয়ে সেই কুইন্টাল তুলো উড়িয়ে দিত দিল্লির লাল কেল্লার সামনে, বহুত লোক জমে যেত।

আর কী করত ? জিজ্ঞেস করে গাঁয়ের বেজায় ভালো মানুষ নিত্যহরি। সত্যহরির পরের ভাই। স্বভাবে তার উলটো। নিত্যহরির ভালো মানুষ হিশেবে সাত গ্রামে খুব খ্যাতি। যে যা বলবে মেনে নেবে। কেউ যদি বলে নিত্য, দিবস কালে তুমি স্নান করো?

কেন হুজুর, আমি স্নান তো করি। নিত্য বলে।

উহুঁ, মোটেই না, আমি জানি।

তখন নিত্য স্বীকার করে নেয়, আচ্ছা বাবু, তুমি যা বলছ তাই, আমি স্নান করি না, করলেও মনে হয় করিনি, না করলে মনে হয় করেছি।

নিত্য তুমি দিনের বেলা ঘুমোও কেন, সবাই যখন রাতে ঘুমোয়। পুঁটিরাম মল্লিক বলে।

নিত্য এই কথাটাও পাকে-প্রকারে স্বীকার করে নেয়। স্বীকার করলে যদি পুঁটিরামবাবু খুশি হয়, সে স্বীকার করবে না কেন? অথচ সে দিনে ঘুমোয় না। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাস্তার মানুষজন দ্যাখে। ফেরিওয়ালা দ্যাখে। পাহারাওয়ালা পুলিস রিকশায় করে ঝিমোতে ঝিমোতে নাক ডাকতে ডাকতে আসামী ধরতে যাচ্ছে, দ্যাখে। তখন অবশ্য সে জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নেয়। তাকেই যদি আসামী ভেবে ফেলে পুলিস, সে তো খুব বিপদ হবে। নিত্য তবু স্বীকার করে নেয়, সে দুপুরে ঘুমোয়। কেন না সে ভালো মানুষ। কারোর কথার বিরুদ্ধে কথা বলে বিবাদ বাঁধায় না। কিন্তু তখন যদি তার বড় ভাই সত্যহরি উপস্থিত থাকে, নিত্যর বিপদ হয়। সে বলে, এই নিত্য, মিথ্যে কথা বলা তোর অভ্যেস, তুই দিনের বেলায় ছিপ ফেলে পুকুর পাড়ে বসে থাকিস না? নিত্য তার স্বভাবে বলল, থাকি।

তবে যে বললি, দুপুরে ঘুমোস? সত্য জামার হাতা গুটিয়ে এগিয়ে যায়। ঝগড়া লাগাবে ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু ভাই যে খুব শান্ত। ঝগড়া করবে কেন? তাই ভাইয়ের সঙ্গেও তার কোন্দল হয় না। হতে পারে না।

নিত্য চুপ করে থাকে। সত্য আগডুম বাগডুম মিথ্যে কথা বলে আচমকা চুপ করে গেল পুটিরাম গলা খাঁকারি দিলে। পুঁটিরামের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধানো তার খুব ইচ্ছে, কিন্তু খুব সাহস হয় না। দিল্লি ফেরত পুঁটিরাম মল্লিক, ভূত নিয়ে ঘর করে। তার কত ক্ষমতা! প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে নাকি তার যাতায়াত ছিল। সে তুড়ি মারলেই নাকি সুখবীর পালোয়ানের ভূত এসে যাবে। তখন কী যে হবে? তবু সে একদিন চেষ্টা করবে। তবে কি না ভুল লোকের সঙ্গে কলহ করায় বিপদ আছে তাও জানে সত্য। সে একবার ভুল লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছিল নিশিগঞ্জে। জানত না সে ক্যারাটে মাস্টার। এমন প্যাঁচ দিয়েছিল সে কুপোকাত। তাই দেখে চাদ্দিকের লোক সকলে হাততালি দিতে লাগল। সত্যর মনে খুব ইচ্ছে সে একবার পুঁটিরাম মল্লিকের সঙ্গে কলহ করে। কিন্তু তার তিনটে পোষা ভূত। সাহস হয় না।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, আজ কজনের সঙ্গে হলো সত্য?

সত্য বলে, আমি মিথ্যে একদম সহ্য করতে পারি না, কিন্তু সকলে ভাবে ঝগড়া করি।

পুঁটিরাম বলল, ঝগড়ুটে লোকের পরিণতি আমি দেখেছি, ঝগড়া না করাই ভাল।

কী পরিণতি? নিরীহ ভালো মানুষ নিত্যহরি জিজ্ঞেস করল।

কী আবার,দিল্লির দরিয়াগঞ্জে একটা লোক ছিল, তার নাম সচদেব সিং, সেই সচদেব বহুত ঝগড়ুটে থা,এক দিন সুখবীরের সঙ্গে ঝগড়া করতে এল, তো কী হলো, সুখবীর এমন দিল।

কেমন দিল স্যার? সত্যহরি জিজ্ঞেস করল। তার মনে হচ্ছিল সচদেব সিং মানে সত্যহরি হাজরা। তাকেই বলছে। সত্যহরি ভাবে, বলবে নাকি পালোয়ান গোবরবাবুর কথা। গোবরবাবুর চেয়ে সুখবীর বেশি পালোয়ান ছিল? কী হলো সেই সচদেবের? পুঁটিরাম খুব বুদ্ধি ধরে। সে বলল, এক ঝটকায় তাল গাছের মাথায় তুলে দিল সচদেবকে, যা বেটা বসে থাক।

তালগাছের মাথায়, সত্যি? ভালোমানুষ নিত্য জিজ্ঞেস করল।

ইয়েস, সাচ। পুঁটিরাম পা নাচাতে নাচাতে বলল।

সত্য বলল, এ হতে পারে না, কভি নেহি।

পুঁটিরাম বলে, আরে হুয়া হুয়া হুয়া।

সত্য বলল, নেহি হুয়া নেহি হুয়া নেহি হুয়া।

লেগে গেল প্রায়। সত্য বলে,বললে হবে, এক চড়ে তালগাছের মাথায়?

দিল্লি যা, সব নিউজ পেপারে বেরিয়েছিল, এরোপ্লেন থেকে দেখা গিয়েছিল সব।বলে পুঁটিরাম চলল পান কিনতে।সত্যহরি একা একা গজরাতে লাগল। তার ক্ষোভ হলো নিত্যহরির উপর। সে কিছু বলুক তার পক্ষে। ভালমানুষ হয়ে থাকলে হবে? গোবর পালোয়ানের চেয়ে বড় পালোয়ান এই ব্রহ্মান্ডে জন্মায়নি। গোবরবাবু অবশ্য কারো গায়ে হাত দিতেন না। ভারি শান্ত আর ভালমানুষ ছিলেন। সে একা একা গজরাতে থাকল, কভি নেহি হুয়া, নেহি হুয়া।

পান কিনে চিবোতে চিবোতে ফিরে এল পুঁটিরাম। তখন তাকে নিত্যহরি খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হলো?

কী আবার হবে, ইতনা উচা তালগাছ, তালগাছের উপর বসে সচদেব কানতে লাগল, সুখবীর হাসতে লাগল নিচে দাঁড়িয়ে। পুঁটিরাম কথাটা বলে সত্যহরির দিকে তাকায়। সত্যহরি বলল, হতেই পারে না, টিভিতে বলেনি।

আরে টিভি কেন সিনেমায় ভি বলেছে,হ্যাঁ,তিনদিন ধরে কাঁদল সচদেব, তারপর একটা চিল এসে মুখে করে নিল সচদেবকে, তিনবার পাক দিয়ে কুতুব মিনারের উপর রেখে দিল। বলে পুঁটিরাম তার গোঁফ মুচড়োতে থাকে।

নিত্যহরি বলল, কুতুব মিনার, ইতিহাস বইয়ে ছবি দেখেছি, সে তো খুব উঁচু শুনেছি।

সাচ, বহুত উঁচা। আকাশে তার মাথা ছুঁয়েছে। বলল পুঁটিরাম।

হতেই পারে না। দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল সত্যহরি।

আরে হুয়া হুয়া হুয়া।

নেহি হুয়া নেহি হুয়া। বলল সত্যহরি।

নিত্যহরি ধনঞ্জয় তখন এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করল,লোকটা কুতুব মিনারেই রয়ে গেল?

নেহি। পুঁটিরাম পা নাচিয়ে বলল, সে এক কাণ্ড হলো।

কিছুই হয়নি। সত্যহরি গর্জন করে বলল।

আরে থাম থাম থাম, কী হলো তার তুই কী জানিস, সম্রাট কুতুবুদ্দিন শাহর সিপাই গিয়ে নামালো। বলে পুটিরাম পান মুখে দিল আবার।

কুতুবুদ্দিন শাহর সিপাই কী করে এল? নিত্যহরি নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করল।

এল, আসবে না কেন? পুঁটিরাম মল্লিক বিজ্ঞের মতো বলল।

তারা কি বেঁচে আছে, সে তো পাঠান আমল, পাঁচ-ছ'শো বছর আগের কথা? ভালমানুষ নিত্যহরি জিজ্ঞেস করল। আর তা শুনে সত্যহরি বলল, হাঁ, সব ঝুটা হায়।

হেসে হাত তুলে সকলকে থামিয়ে পুঁটিরাম মল্লিক বলল, বেঁচে থাকবে কেন, সব কবর থেকে উঠে এল কুতুব মিনারের মাথায়, সচদেবকে নামিয়ে দিল।

কবর থেকে উঠে...? সত্যহরির গর্জন থেমে গেল, সে অবাক।গা ছমছম করে উঠল। নেহি বলতে পারল না।কিন্তু ভালমানুষ নিত্যহরির অত ভয় নেই, সে বলল, তারপর সিপাইগুলো কী করল?

দুজন বাদে বাকি সব আবার কবরে গিয়ে ঘুমোতে লাগল। বলল পুঁটিরাম মল্লিক।

উফ, এমন গল্পে কি গা ছমছম করবে না ? কবর থেকে বেরিয়ে এসে আবার কবরে গিয়ে ঘুমোতে লাগল। পুঁটিরাম মল্লিক জানেও বটে। কিন্তু তারপর কী হলো? দুজন বাদ হলো কেন? সেই দুই সিপাই গেল কোথায় কবর থেকে বেরিয়ে কুতুব মিনার থেকে সচদেবকে নামিয়ে ?

পুঁটিরাম বলল, তারা তার সঙ্গে দিল্লি থেকে চলে এল।

আর সেই সুখবীর? তার কী হলো? কী আবার হবে? সেও এল এই খলসেখালিতে। সে তো আছে তার সঙ্গে। কিন্তু একটা কথা হয়নি জানা, সুখবীর কবে মরে গেল যে ভূত হলো? ধনঞ্জয়ের কর্মচারী ভুতো জিজ্ঞেস করল। শুনে হা হা করে হাসতে লাগল পুঁটিরাম। উঠলো। আবার পোস্টাপিস যাবে। চিঠিটা এল কি না দেখতে হবে। সে যাওয়ার আগে বলল, আরে সুখবীর তো আদমি ছিল না কোনো কালেই, সে তো ঘোস্ট ছিল, মানে ঘোস্ট হয়েই তার জন্ম হয়েছিল, তার মা ঘোস্ট, বাবা ভূত, ব্রিটিশ আমলে জন্ম।

তারা বসেই থাকল দোকানের বেঞ্চিতে। পুঁটিরাম গেল চিঠি আনতে। চিঠি এলেই সে তিন অনুচর নিয়ে আবার দিল্লি মেল ধরবে। কিন্তু সত্যহরি দাঁত ঘষছে। পুঁটিরাম ফিরে এলেই চেপে ধরবে তাকে। ঘোস্ট হয়েই কবে জন্মেছিল সুখবীর পালোয়ান, তা বলতে হবে পুঁটিরামকে। নতুবা তার রেহাই নেই।

হাওয়াগঞ্জের ফুলমেলা



লোকটার নাম, কেউ বলে সে ভবরঞ্জন। নাম তো কারো গায়ে লেখা থাকে না, তাই সে রঞ্জন না ভবরঞ্জন কিংবা সুরঞ্জন তা কেউ বলতে পারে না। আসলে সে একটা লোক। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।এ গ্রাম সে গ্রাম। ভবঘুরে বলতে পারো তাকে। কত জায়গায় যায় সে। কত পাহাড়, নদী, বন, প্রান্তর দেখেছে সে। ঘুরতে ঘুরতে কত গ্রাম-গঞ্জ হাট-বাজার পার হয়েছে সেই একটা লোক। ভবঘুরে ভবরঞ্জন। সেই ভবর কথা বলতে বসেছি। তার কাঁধে একটা ঝুলি থাকে। সেই ঝুলির ভিতরে অনেক কিছু থাকে। লাল নীল গল্প।

হুঁ,নানা রঙের গল্প।বসন্ত দিনে যে ফুল ফোটে তার রঙ মেশানো গল্প।

এক বসন্তের দিনে মানে ফাগুনের আরম্ভে ভবরঞ্জন অনেক দূরের এক পাহাড়তলীতে পৌঁছল। সেই পাহাড়ের দেশে তখন গাছে গাছে নতুন পাতা, হাওয়াকল ঘুরছে। হ্যাঁ, কত হাওয়াকল বাতাসে বনবন করছে। ফুল ফুটেছে গাছে গাছে। লাল নীল হলুদ সবুজ। গাছের পাতায় রঙ এসেছে। ভবরঞ্জন এসেছে এই জন্য। সে আসে। এসে একটা হৈ হৈ-এর ভিতর জুড়ে যায়।কী হৈ হৈ ? না পাতা আর ফুল ফোটার উৎসব। এই যে পাহাড়তলী, এখানে পাতা আর ফুল ফোটার উৎসব হয়। গাঁয়ের মানুষ তখন নতুন জামা পরে ফুলের মুকুট পরে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসে পথে। মেলা বসে যায়। জিলিপি, কদমা, মুড়কি, পাঁপর আর পান্তুয়ার দোকান বসে যায়। ভবরঞ্জন একটা বড় গাছের নিচে তখন কদিন আশ্রয় নেয়। সে হলো

ভবঘুরে। ভবঘুরের ঝুলিতে অনেক গল্প থাকে। গাঁয়ের মানুষ তার কাছে গল্প শুনতে চায়, হ্যাঁ গো, কী এনেছে ঝুলি ভরে, কী শোনাবে এবার ? লাল নীল হলদে সবুজ গল্প।

এক অনেক কালের পুরোন দোকানি তার দোকান বসাচ্ছিল প্রান্তরে, মেলার মাঠের ধারে। তার নাম রমানাথ। বলল, হ্যাঁ গো কিছু শুনেছ?

ভবরঞ্জন বলল, কী শুনব, এই তো এলাম, বটের তলায় ঘুমোব, মুড়ি মুড়কি খাব আর গল্প শুনাব।

দোকানি বলল, এবার নাকি শেষ মেলা?

কেন, পরের বছর হবে না? ভবরঞ্জন জিজ্ঞেস করল।

ফুল আর পাতা আর নিজেদের থাকবে না। দোকানি বলল।

কেন গো কেন, আমি তো দেখলাম ফুটেছে অনেক। ভবরঞ্জন বলল।

দোকানি যা বলল, তা অন্য রকম। ফুল ফুটেছে। ফুটবে না কেন, কিন্তু ফুল সব কিনে নিয়েছে এক বড় ব্যাপারি। ব্যাপারির নাম হুদুয়া লাখন। সে বলছে, হাওয়াগঞ্জে যত ফুল ফুটবে সব ফুল তার, সে রপ্তানি করবে শহরে। শহরে খুব ফুলের চাহিদা। গঞ্জে আর ফুল থাকবে না।

কে বলল এই সব কথা? জিজ্ঞেস করল ভবরঞ্জন।

ব্যাপারি বলল, গাঁ থেকে লোক এসেছিল এখেনে, বলল, এবার শেষ মেলা, এরপর এই হাওয়াগঞ্জে ফুল পাতার মেলা আর হবে না, হুদুয়া লাখন শুধু সাতটা গাছের ফুল দিয়েছে এবারের মতো ছাড়, মেলা চলবে, বাকি ফুল মেলার সময় তার লোক তুলে নেবে, দেশ-বিদেশে পাঠাবে, ফুল নষ্ট হতে দেবে না। কিন্তু সেই সাতটা গাছের ফুল হুদুয়া লাখনের লোক তুলেই নিয়েছে আগে। আবার যদি ফোটে।

ভবরঞ্জন অবাক। দোকানির চালার নিচে কত রাত অবধি সে গল্প করতে থাকে। দোকানি বেশ বুড়ো হয়েছে। সে অন্তত তিরিশ বছর ধরে আসছে হাওয়াগঞ্জে। এখানে কত হাওয়া। দুই পাহাড়ের মধ্যে গঞ্জ। গঞ্জের মানুষ তাকে খুব ভালো চেনে। দোকানি বলল, এবারই ভালো মেলা হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু সকালে মেলার মাঠ ভরে যেতে থাকে। ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে ভবরঞ্জন ভবঘুরে দ্যাখে দোকানির কথা ঠিক। গাছে গাছে পাতা, কিন্তু ফুল নেই। দূর দিগন্ত ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে থাকে এই সময়। মেলার পর ফুল তো এমনিই ঝরে যায়। কিন্তু এবার ঝরার আগে ব্যাপারি হুদুয়া লাখন সব তুলে নিয়েছে। আছে একটা দুটো গাছে সিঁদুরে রঙের পলাশ ফুল, কিন্তু তা সংরক্ষিত। হুদুয়া লাখনের লোক তাতে হাত দিতে পারবে। সিপাই লাঠি হাতে ঘুরছে, পাহারা দিচ্ছে ফুল সমেত গাছ।

মেলা এক পক্ষের।বসন্ত পূর্ণিমায় শেষ হবে। সেদিন ফুলের মালা গলায় পরে গান হয়, নাচ হয়। এবার ফুল ছাড়া সব হবে, নাটক, বাজনা। আনন্দ কি তাতে হবে? মেলা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলল। ভবরঞ্জন তার ঝুলি থেকে কত গল্প বের করল। সাগরতীরে কী হয়েছিল। একটা জাহাজ হারিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল। মাঝ সমুদ্রে নাকি দিক ভুল করেছিল। আহা, ফিরে তো এসেছে। ফিরে যখন এসেছে আর চিন্তা নেই। ভবরঞ্জন তখন আর এক গল্প বের করল ঝুলি থেকে, একটা ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে কিংবা পালিয়ে গেছে একা একা।

তারপর কী হলো? গল্প শুনতে আসা লোকে জিজ্ঞেস করল।

ভবরঞ্জন বলল, তারপরটা জানিনে, তাকে খোঁজাই হচ্ছে, শাদা ঘোড়া, খুব ছুটতে পারে।

কিন্তু হারিয়ে গেল কোথায়? জিজ্ঞেস করল গঞ্জের এক লোক।

কোথায় গেল তাই তো জানা গেল না। বলল ভবরঞ্জন।

এ কেমন গল্প হলো, এর কোনো মানে নেই। মাথা নাড়তে থাকে গঞ্জের মানুষ।

ভবরঞ্জন বলল, এবার সে জুত পাচ্ছে না, কেন পাচ্ছে না বলতে পারবে না।

বানিয়ে বলো, গল্পটা মিঠা হোক। বলল লোকটা।

বানাতেও পারছি না। ভবরঞ্জন বলল।

হুঁ, জিলিপি, পান্তুয়া এবার কম মিঠা, মাদারি খেল করে যারা দড়ির উপর হাঁটে, হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে ছেলেটা। এ কেমন?এমন তো হয় না।

ভবরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, সেই হুদুয়া লাখনের বাড়ি কোথায়?

পশ্চিমে হবে।

হুদুয়ার সঙ্গে আমার দেখা হবে?

গঞ্জের মানুষ বলল, হুদুয়াকে আমরাই দেখিইনি।

তাহলে জানলে কী করে ফুল সব নিয়ে নেবে?

চোঙা ফুঁকে বলে গেছে তার লোক, বসন্ত আসার আগে থেকে চোঙা ফুঁকে যাচ্ছে। লোকটা বলল।

দোকানি বলল, মেলাতেও শুনতে পাবে।

হ্যাঁ, শোনা গেল। মেলা বসল আর চোঙা নিয়ে একুশটা লোক গেয়ে যেতে লাগল।দয়া করে ফুলে হাত দিবে না। ফুল সব হুদুয়া লাখন মশায়ের। তিনি সব গাছের মালিক। গাছের ফুল ও ফল। যার যার নিজের বাগান আছে সে সে নিজের বাগানের ফুলে হাত দাও। বাকি ফুল হুদুয়া কুম্পানির। আর বাগানের ফুল যদি দিতে চাও, কুম্পানি ভালো টাকা দিবে। এক ফুলে এক পয়সা।

বোঝা গেল। হুদুয়া লাখন অনেক টাকা সরকারের ঘরে জমা দিয়ে ফুল কিনে নিয়েছে। বসন্তে কি শুধু অশোক, পলাশ, শিমুল, মাদার পুষ্প হয়? নিম গাছে ফুল ফোটে, আমের মুকুল হয়। আমের মঞ্জরীও ফুল। ফুলে হুদুয়া লাখনের অধিকার। মেলার দ্বিতীয় দিন চোঙাওয়ালারা বলতে লাগল, মেলা চলুক কিন্তু ফুলে হাত দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেলায় ঘুরতে লাগল দারোগাবাবু আর তার অনুচর পুলিশ। আর পুলিশের গুপ্তচর কেউ কেউরা। তারা নাকি ফুল পাহারা দেওয়ার আদেশ পেয়েছে সরকারের ঘর থেকে। সরকার কে, না হুদুয়া লাখন সরকার, বলল এক পুলিশ। তা শুনে দারোগা তাকে খুব কষে বকে দিল। সরকার মানে সরকার তা বোঝ না মূর্খ। মূর্খ পুলিশ বুঝল না, হুদুয়া লাখন কেন সরকার হয়েও সরকার না। যাই হোক, চালু হয়ে গেল আইন। আইন শুধু হাওয়াগঞ্জের মানুষের জন্য। দারোগার বিবি দারোগানি ফুল চেয়ে বায়না করতে তা এনে দিল দারোগা। দারোগানি ফুলের গয়না পরে মেলায় ঘুরতে লাগল।তা দেখে গাঁয়ের লোক ফুল পাড়তে গেলে, লাঠি হাতে পুলিশ হাজির। খবদ্দার না। বলল, দারোগানির অনুমতি নেওয়া আছে। ফুলে হাত দিতে অনুমতি লাগবে। হুদুয়া লাখন সরকার এক লক্ষ এক টাকা সরকারের ঘরে জমা করে ফুলের অধিকার নিয়েছে। বিনা অনুমতিতে ফুলে কেউ হাত দিলে তিন মাস জেল তিন সিজিন ফুলের মেলায় আসা বারণ আর তিন বছর কিছু একটা করতে হবে। ফুল তুলে হুদুয়ার গোলামি করতে হবে, এমন কঠিন কঠিন শাস্তি। এক অপরাধে তিন শাস্তি।

তাহলে হলো কী ? ফুলের মেলা ঠিক হলো না। মিঠাইয়ে মিষ্টি কম, নাটকে লোক নেই, গানের সুর কেটে গেল, সার্কাসের হাতি বসেই থাকল, নড়ল না, মোটর সাইকেল গর্জন করেও নড়ল না। জোকারকে লম্বা দেখাতে লাগল। ফুলের মালা না হলে কি গান হয়, জোকারের হাসি হয়, না মেলা হয়?ভবরঞ্জন দুঃখিত হয়ে মেলা ছাড়ল। পূর্ণিমার আগেই সব গাছ পুষ্পবিহীন হয়ে গেল। হুদুয়ার লোক সব ফুল পেড়ে নিল। খা খা করতে লাগল চাদ্দিক। হাওয়াগঞ্জের ফুল-মেলা নাকি উঠেই যাবে শোনা গেল। কিন্তু ব্যাপারিরা আর ভবঘুরে ভবরঞ্জন বলল, কিছুতেই না, মেলা হবে, আমরা আসব।

মেলা না বসলেও তোমরা আসবে ?

ব্যাপারি বলল, আসব, আমি পাথরের জিনিশ নিয়ে আসি, সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি ফুল-মেলার জন্য, বন্ধ রাখলে হবে না।

গাঁয়ের লোক বলল, ফুল ছাড়া ফুল-মেলা হয় নাকি?

হয় হয় হয়, মেলা বসলেই হয়। বলল ভবরঞ্জন।

গাঁয়ের লোক বলল, এবারের মেলা কি ভালো হলো, তোমার গল্প ভালো হলো না, মাদারির খেলা জমল না, সার্কাসের মোটর সাইকেল চলল না, নাটকের ডায়ালগ ভুল হয়ে গেল, আর ফুলের গয়না পরে মেয়েরা গান করল না, এসব না হলে মেলা হয়।

হয় হয় হয়,পরের বছর হবে। বলে ভবরঞ্জন ভবঘুরে আর দোকানি চলে গেল হাওয়াগঞ্জ ছেড়ে। আরো সব দোকানদানি উঠে গেল। মেলার মাঠ ঝিমঝিম করতে লাগল। হুদুয়া লাখন কোম্পানি বাকি ফুল তুলে নিয়ে চলে গেল। আমার মুকুল ছিড়ে নিয়ে গেল। নিমের ফুল ঝরিয়ে দিয়ে গেল। ইস, হাওয়াগঞ্জের হাওয়া যেন আসা বন্ধ করে দেবে। তারা তো ফুলের গায়ে বাতাস দিয়ে ফুলের রঙে রঙিন হয়ে অনেক দূরে চলে যেত। বাতাসে কত ফুলের রঙ লেগে যেত। সব কি না বন্ধ হয়ে গেল।

বছর যায়। কালবৈশাখী হয়, মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়, শরতকাল আসে, শীত এল। শীত এল যখন বসন্তের আর কত দেরি? গঞ্জের মানুষ মন খারাপ করে হুদুয়া লাখন সরকারের চোঙা ফোঁকা লোকজনকে আসতে দ্যাখে শীতের ভিতরেই। মানুষজনকে আগাম সতর্ক করা হচ্ছে,

ফাগুন, চৈত দুই মাস,
হুদুয়া লাখন দিইছে ফাঁস।
লাখন সরকার ফুল কিনেছে,
ফুল নিয়া সে ব্যাপারি হয়েছে।
ফুলে কেউ হাত দেবে না।
ফুলের দিকে চোখ দেবে না।
লাখন সরকার, লাখ টাকা,
জমা দিয়ে করল পাকা
ফুল ফুল ফুল, ফুলটি তার।
ফুল ছুঁইলে লাঠির মার।

খুব মন খারাপ হলো হাওয়াগঞ্জের মানুষের। মন খারাপ করে হাওয়াগঞ্জের হাওয়া অন্য দিক দিয়ে বইল। হাওয়াকল ঘুরল না। হাওয়ার গায়ে রঙ লাগলো না। হায় হায়, এ কী হচ্ছে? লাখন সরকার করল কী? মানুষের চোখের জল পড়ল ভুঁয়ে। এমন করে কি মেলা হয়? ফুল না থাকলে ফুলের মেলা কেমনে হয়? হয়নি মেলা সেবার কেন পরেরবারও। কেন হয়নি?

সেই গল্প নিয়ে ভবরঞ্জন ঘুরছে। কী সব্বোনাশ, হাওয়া যেমনি বন্ধ হলো হাওয়াগঞ্জে তেমনি আর কিছু হয়েছিল। লাখন সরকারের লোক ফুল নিতে এল বড় বড় লরি নিয়ে, কিন্তু ফাগুন গেল চৈত গেল, হাওয়াগঞ্জের কোনো গাছে ফুল ফুটল না। একদম না। বছর বছর লাখ টাকা জমা করে সে ফুল তুলতে, কিন্তু ফক্কা হলো, গাছেরা মুখ ফিরিয়ে থাকল। ফুল ফুটল না তাই হতাশ লাখনের লাখ টাকা ধুলো হয়ে গেল। দোকানি জিজ্ঞেস করে তারপর কী হলো ভবঘুরে গল্পওয়ালা? হবে কি লাখন সরকার ফিরে গেল। পরের শীতে আর চোঙা ফুঁকতে কেউ এল না। এল না যখন লাখন গেছে। পুলিশের সেপাই গাছ পাহারা দিতে ঘুরল না,তার মানে হুদুয়া লাখন সরকার গেছে। বছর বছর লাখ টাকা লোকসান দেবে কেন সে।

তারপর কী হলো? সাগর পাড়ে বসে দোকানি জিজ্ঞেস করে ভবঘুরে গল্পওয়ালাকে।

ফাগুন আসছে, বসন্ত আসছে, চলো হাওয়াগঞ্জ, হাওয়াকল নাকি ঘুরছে আবার বনবনিয়ে।ফুল ফুটব ফুটব করছে। কে বলল এসব কথা। কেন ভবঘুরে ভবরঞ্জন বলল। আবার ফুল-মেলা। আবার জিলিপি পান্তুয়া। ওই যে ভবরঞ্জন চলেছে হাওয়াগঞ্জে তার গল্পের ঝুলি নিয়ে। খুললেই সব জানা যাবে।

চোরভুবন ও সাধুভুবন



তিন গাঁয়ে চারজন ভুবন মণ্ডল। এদের একজনই চোর, বাকিরা সব সাধু। কথাটা দারোগাবাবুর। লিকলিকে দারোগা, বাতাস দিলে প্রায় টাল খায়। কিন্তু খুব কড়া। চোর তিনি ধরবেনই। খরবালার বাবা ভুবনকে জেরা করেই যাচ্ছেন এক বছর ধরে। কখনো থানায় ডেকে, কখনো মোবাইলে। তাতে খরবালার মান যাচ্ছে।তার বাবা চোর। হতেই পারে না। বাবা সারাদিন কত কাজ করে। চাষবাস, বেড়া বাঁধা, পুকুর কাটা, জমিতে নিড়েন দেওয়া আর সন্ধে বেলায় কীত্তন। তার বাবা না বলিয়া পরের দ্রব্যে হাত দেয়ই না। কিন্তু দারোগার কাছে খবর চোরের নাম ভুবন মণ্ডল। ধনেশ্বর রায়ের চোরাই বাসন চুরি করেছে ভুবন মণ্ডল। যদিও দারোগা বলেনি তা চোরাই বাসন। বলেছে খরবালার বাবা ভুবন তার মেয়েকে। বাবাকে একদিন থানায় বসিয়ে রেখে বেলের পানা খাইয়ে জেরা করেছিল দারোগা। খরবালা কোমর বেঁধে থানায় হাজির। তার খুব মুখ। মুখরা আর রাগী। তাকে ভুবন নিজেই ভয় করে।

প্রহ্লাদ সরকার, দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন, তুমি নিয়েছ?

ছার, আমি কেন নেব?

চুরি কেন করে ভুবন?

ভুবন বলেছিল, কী জানি ছার, বলতি পারবনি।

চুরি করা পাপ।

হ্যাঁ ছার, আর চোরাই মাল কেনা?

সেও পাপ। প্রহ্লাদ দারোগা মাথা নেড়ে বলেছিল।

লোকে চোরাই বাসন কেনে কেন?

দারোগা বলেছিল, আমি কী করে জানব?

আপনি দারোগা ছার বলে কথা, আপনি জানবেন না তা কি হয়?

দারোগা বলেছিল, কিন্তু এখেনে সে কথা কেন?

ধনেশ্বর রায়ের যে বাসন চুরি গেছে তা চোরাই বাসন। বলেছিল ভুবন।

খরবালা তফাতে বসে দারোগা আর তার বাবার জেরা করাকরি শুনছিল। দারোগা জিজ্ঞেস করেছিল, কে বলল চোরাই বাসন?

আপনি তারে জিজ্ঞেস করেন।

দারোগা বলেছিল, সে কি স্বীকার করবে?

ছার আপনি জিজ্ঞেস করেন, দেখুন সে কী বলে?

সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে ধনেশ্বর রায়কে ধরেছিল দারোগা।হ্যালো হ্যালো।

ধনেশ্বর নয়, জবাব দিয়েছিল একটি মেয়েলি গলা, দি নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড, ইজ নট রিচেবল।

কী হলো ছার?

প্রহ্লাদ দারোগা বলেছিল, নট রিচেবেল।

তবে দেখুন আমার কথা সত্যি কি না? ভুবন বলেছিল।

হুম। দারোগা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, বিড়বিড় করেছিল, কোথায় গেল ধনেশ্বর তার মোবাইল নিয়ে!

চোরাই মাল কিনতে ছার।

আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব। দারোগা বলেছিল।

বলুন ছার, এখন আমি তবে যাই।

এস, কিন্তু খোঁজ দিতে হবে কোন ভুবন চোর।

তখন খরবালা বলেছিল, বয়েই গেছে খুঁজতে, কেন খুঁজবে আমার সাদাসিদে বাবা, যে কোনোদিন রাস্তায় সিকি আধুলি পড়ে থাকলেও হাত দেয় না, সাধু মানুষ।

দারোগা খরবালাকে ভয় করে। তাই বেশি জেরা না করেই ছেড়ে দিয়েছিল। আগে একবার খরবালা বলেছিল, তার বাপকে না ছাড়লে সে গায়ে আগুন দেবে। সেই ভয়টা আছেই। বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে খরবালা জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা কোন ভুবন চোর?

ভুবন বলেছিল, কদমগাছিতে এক ভুবন আছে, আমার মনে হয় সে।

কথাটা তুমি বলনি কেন দারোগাবাবুকে? খরবালা জিজ্ঞেস করে।

তার কাছে না জিজ্ঞেস করে কি বলা যায়? বলল ভুবন।

খরবালা বলল, তাইলে কদমগাছিতে চলো।

এখন? ভুবন জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ এখন, এর একটা বিহিত করা দরকার, দারোগা বারবার থানায় ডাকবে আর ছুটবে তুমি, তা হবে না।

রিকশা নিল ভুবন আর তার মেয়ে। রিকশাওয়ালা আধবুড়ো মধুসূদন দাস। সে ঝাউতলায় বসে ঝিমোচ্ছিল। তাকে ডাকতে সে আড়ামোড়া ভেঙে বলল, কদমগাছির ভুবন যদি বাড়ি না থাকে ?

না থাকে তো ফিরে আসব মধুকাকা।

না, সে যতক্ষণ না ফেরে বসে থাকতে হবে। মধুসূদন শর্ত দিল।

কেন সে যদি আজ না ফেরে, তখন? খরবালা জিজ্ঞেস করল।

অপেক্ষা করতে হবে। মধুসূদন বলল।

ওমা, রাতে কোথায় থাকব?

কদমগাছির কদমতলায়।

কী খাব?

ব্যবস্থা হবে।মধুসূদন বলে, চিড়ে গুড় কিনে নিও পথের দোকান থেকে।

কাণ্ড দ্যাখো। চিড়ে গুড় খেয়ে অপেক্ষা করতে হবে সেই কদমগাছির ভুবন মণ্ডল কখন ফেরে। এদিকে সব ভুবনই মণ্ডল ভুবন। আর চোর ভুবনও তাই। এমন হওয়ার জন্যই আসল ভুবন মানে চোর ভুবন ধরা পড়ে না। এখন কদমগাছির ভুবন যদি চোর হয় আর চুরি করতে বের হয়, তাহলে তো অপেক্ষা করতেই হবে চুরি করে না ফেরা পর্যন্ত। ফিরে আসা যাবে না মধুসূদন রিকশাওয়ালার শর্ত অনুযায়ী। খরবালা তবু বলল, চলো, দিনের আলোয় আলোয় যেতে হবে, চোর হলে অন্ধকারে বেরিয়ে যাবে।

রিকশাওয়ালা বলল,হুঁ, কিন্তু যদি শোনো সে গেছে যাত্রাগাছি, যাবা কি?

দেখা যাবে তখন, আগে তো চলো। খরবালা বলল।

সেটাও চুক্তি করে নাও, যাত্রাগাছি যেতে হবে। বলল মধুসূদন।

আচ্ছা হবে। খরবালার তর সইছিল না।

তখন মধুসূদন বলল, তাইলে আগে বরং যাত্রাগাছি যাই, সেখেনে যদি তারে পাই তো হয়ে গেল, যাত্রাগাছি আমার খুব ভালো লাগে, কেমন বড় বড় ধুতরো, আকন্দ আর ভাট ফুল ফোটে, গাছে কাঁটাল পাকে, ঘানিতে সর্ষের তেল, ময়রার দোকানে গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা আর লেডিকেনি, গাছে ময়না, কোকিল আর মাঠে গরু, দিনে কেউ না রাত্তিরে চোর।

হয়েছে চলো এবার। বলল খরবালা।

হ্যাঁ চলো। রিকশায় প্যাঁক করল মধুসূদন, চলো রাইগাছি।

আবার রাইগাছি কেন? ভুবন জিজ্ঞেস করে।

আবার কেন, রাইগাছি না গেলে যাত্রাগাছি যাওয়া যায় না। বলল মধুসূদন।

আরে আমরা যাব তো কদমগাছি। বলল ভুবন।

কদমগাছি তো যাব না, যাব যাত্রাগাছি, তার আগে রাইগাছি। বলে মধুসূদন রিকশায় প্যাঁক প্যাঁক করতে লাগল।

রাইগাছি যাব কেন? জিজ্ঞেস করে খরবালা।

রিকশাওয়ালা ভ্যাবলা হয়ে বলল, তাতো জানিনে খুকি।

জান না মানে? খরবালা খরখর করে উঠল, তুমি জান না তো জানবে কে?

রিকশাওয়ালা বলে, যাবে তুমি আর ইনি, জানব আমি, কোন কেলাসে পড় খুকি?

এই খুকি খুকি করবে না তো, আমি খুকি? খরবালা তেড়ে গেল প্রায়।

মধুসূদন বলে, তাইলে কী?

খরবালা বলে, আগে ভুবন মণ্ডলের কাছে চলো, তারপর জানবে আমি কী?

রিকশাওয়ালা প্যাঁক প্যাঁক করল, রাইগাছি যাত্রাগাছি কার বাড়ি যাবে বললে না তো?

খরবালা রাগে গরগর করছিল, বলল, তুমি আগে রিকশা ছাড়ো, আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি।

বাহ, বেশ বেশ!বলতে বলতে রিকশা ছেড়ে দিল মধুসূদন, গলা ছেড়ে দিল, শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন লাগল নাচন...।

খরবালা তার বাবাকে বলল,হেঁটে চলো, এই গরমে কী গাইছে শোনো।

সঙ্গে সঙ্গে রিকশাওয়ালা গান বদল করে দিল, খর বায়ু বয় বেগে...।

খরবালা খুব রেগে গেল কিন্তু কিছু করতে পারে না। এই গান রবি ঠাকুর নাকি তার কথা ভেবেই লিখেছিলেন। বলেছিলেন ইস্কুলের পণ্ডিত স্যার। পণ্ডিত স্যার কি বেঁচে আছেন? খরবালা শুধু ফেল করত। শেষে পড়া ছেড়েই দিল। বনবন করে মধুসূদনের রিকশার চাকা ঘুরতে থাকে। পণ্ডিত স্যারের গান মধুদা রিকশাওয়ালা জানল কী করে? মধুসূদন গান থামিয়ে বলল, গানটা উনি গাইতে গাইতে যেতেন তো, মানে ধলতিথের পণ্ডিত মশাই, আমিই তো তাঁরে নিয়ে যেতাম ইস্কুল অবধি।

যাহ বাবা! তার মনের কথা বুঝে ফেলল কী করে রিকশাওয়ালা মধুকাকা?

মধুসূদন বলল, হেঁ হেঁ হেঁ, আমি সব বুঝি, তেনাদের ইস্কুলে পড়েচি আমি।

উফফ, তেনাদের ইস্কুল মানে ওই তেনাদের, যাঁরা শ্যাওড়া গাছে বসে পা দোলান, এক পা পুকুরের এপারে আর এক পা পুকুরের ওপারে, তেনাদের ইস্কুল। কিন্তু খরবালার তেনাদের ভয় নেই। তাকে ভয় দেখাতে এসে তেনারাই তার মুখের চোটে পালিয়ে বাঁচেন। হবেই তো। ভূত তো বটে। মানুষ না।

মধুসূদন বলে, হুঁ, মানষিরে আমার ডর লাগে বেশি।

খরবালা বুঝল তেনাদের ইস্কুলে ভালই পড়েছে মধুদা রিকশাওয়ালা। না হলে কোনো কথা পড়তে পারছে না, তার আগেই ধরে নিচ্ছে। সে আর কিছু ভাববেই না। মধুসূদন প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে বলল, কেলাস থিরি অবধি পড়েচি, তারপর মাস্টার মরে গিয়ে মানুষ হয়ে গেল আবার, ইস্কুল উঠে গেল, আর কিছু জিজ্ঞেস করবে খরখরি খুকি?

কদমগাছির ভুবন মণ্ডলকে চাই আমার। খরবালা বলে।

চলো তাঁরে ধরতেই তো যাচ্ছি যাত্রাগাছি, রাইগাছি, আমড়াগাছি...।

খরবালা ভাবল কী কুক্ষণেই না মধুকাকা রিকশাওয়ালার রিকশায় উঠেছে। আষাঢ়ের বেলা বলে রক্ষে। নইলে যেতে যেতে সন্ধে হয়ে যেত। রিকশা ছুটছে। মধুসূদন গান ধরেছে, ঠিক দুকুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা, আরে ভূত না ভূত না, তেনাদের পুত...।

খরবালার বাবা ভুবন চুপ করে আছে। কী বলবে? দিনমানের এই সময়টায় তার ঘুম পায়। রাত জাগতে হয় কি না মাঝে মধ্যে। সে ঘুমিয়েই পড়ল। তখন রিকশা যাত্রাগাছি হাটখোলায় গিয়ে দাঁড়াল। আজ হাটবার নয়। সব নিঃঝুম। গাছ-গাছালি চুপ। পাতাটিও নড়ছে না। কুকুরগুলো সব পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে রাস্তার হেথাহোথা। মধুসূদন বলল, এইবার বলো কারে চাই।

খরবালা দেখল তার বাবার নাক ডাকছে। আহা ঘুমোক। সে নিজেই এই ভুবন মণ্ডলকে জেরা করে জেনে নেবে সে চোর না সাধু। রিকশাওয়ালার ডাকে রিকশা থেকে নেমে এল খরবালা। রিকশাওয়ালা তাকে বলল, আমি হাততালি দিয়ে ডাকি, দেখি সে আছে কি না।

কেউ তো নেই। খরবালা বলল।

আছে আছে, ভুবনদাদা আছ?

আছিরে আছি, এই যাত্রাগাছি।

আছ তো এস। ডাক দিল মধুসূদন।

সত্যি একজন বেরিয়ে এল হাটের এক চালাঘর থেকে। তার বাবার মতো, না তার বাবার মতো হবে না। লম্বা। তার বাবা আর একটু লম্বা হলে এমনি হয়ে যেত। আর বাবা যদি খুব রোগা হতো, একেবারে এই লোক। বাবার নাকটা খাড়া হলে ইনি প্রায়। লোকটা মানে মধুসূদনের ভুবনদাদা বলল, এই মেয়েটা কে, চিনা মনে হয়।

চিনা না জাপানি কিংবা খরানি হতে পারে। বলল মধুসূদন।

হুম, কী করতে আসা? সে জিজ্ঞেস করল।

সে ইনি জানে। খরবালার দিকে আঙুল তুলল রিকশাওয়ালা।

কী জান? লোকটা খুনখুনে গলায় জিজ্ঞেস করল।

আপনি মানে তুমি কি ভুবনচোর ? জিজ্ঞেস করল খরবালা।

ফিরে আসতে রাত্রি ভোর। সে জবাব দিল।

চুরি করতে লজ্জা লাগে? খরবালা জিজ্ঞেস করে।

হি হি হি, ছেড়েই দিলাম ওই রাগে।

খরবালা বলে, আপনি যদি চোর হন, দারোগাবাবুরে বলি?

বল না গিয়ে ঘন্টা হবে, ভয় করিনে আজকে চলি। সেই লোক ঘুরে দাঁড়াল।

খরবালা বলে, না না যাবেন কেন, শেষ চুরিটা কবে যেন?

সে বলল,দারোগা জানে কেস দিয়েছে, মাঘের আগে অঘ্রান পরে, পৌষ মাসে হবে না কো।

বাসনচুরি হলো তো? খরবালা জেরা করছে।

তাতে তোর কী হলো খরখরি?

আপনার নাম তাইলে বলি পেহ্লাদ দারোগাবাবুরে?

আবার সেই কথা, বললে কী হবে? ভুবনচোর বলল।

জেরা করে কথা বের করে নিয়ে হাজতে ভরে দেবে গরুচোর, ছাগল চোরের সঙ্গে।

ইস, কথা বের করবে, পারবেই না।

জেরায় তো পড়েননি। খরবালা ভয় দেখায়।

পড়িনি আবার।হাসে লোকটা, বলে, তুই যে দেখি মেয়ে দারোগা, তোর কী, আমি চুরি করি না করি আমার ইচ্ছে।

আমার বাবারে যে ডেকে ডেকে, মোবাইলে ফোন করে করে জেরা করে। খরবালা হাত নেড়ে নেড়ে বোঝায়।

তাতে আমার কী?

আমার তাতে মান যায়।

লোকটা বলে, আমার মেয়েরও মান যাবে, দারোগাবাবু জেরা করে করে হদ্দ, যা জিজ্ঞেস করে বলি, "আনি মানি জানি না", আমি জানিনে ছার, আই ডোন নো ছার, মালুম নেহি হুজুর।

খরবালা অবাক, তার মানে?

আমার মেয়ে শিখোয় দেছে, যদি জিজ্ঞেস করে আমার হাত কটা তাও বলি জানিনে ছার।

আরিব্বাস! খরবালা বলল, তার নাম?

বলব না। বলে লোকটা হি হি করে হাসে, বুঝি নাও খরখরি, যাই, আর থাকতি পারছিনে। বলেই সে কোথায় ফুস হলো তা ধরতেই পারল না খরবালা। হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শূন্য হাটখোলার দিকে। আর সেই সময় শোনা যায় মধুসূদন রিকশাওয়ালার ডাক, ও খুকি খুকি, ও ভুবনভাই, ভুবনমেসো...।

খরবালা চোখ মেলল। তার বাবাও চোখ মেলল। আরে, এ যে সেই যাত্রাগাছি হাটখোলা। তাই তো হবে। বাবার দিকে ফিরল সে। বাবা চোখ মুছতে মুছতে রিকশা থেকে নামতেই একেবারে! বাবা একটু বেঁটে হলে তার মতো, একটু মোটা হলে তার মতো...।

মধুসূদন রিকশাওয়ালা বলল, দুজনেই রিকশা চলতে নাক ডাকাতে আরম্ভ করলে, রাতে ঘুমোও না নাকি?

খরবালা রিকশা থেকে নামতে নামতে চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল, মধুকাকা, সে গেল কোথায়?

কার কথা জিজ্ঞেস করছ গো? মধুসূদন রিকশা প্যাঁক প্যাঁক করে জিজ্ঞেস করে।

না মানে? খরবালা তার বাবার দিকে তাকায়।

তখন মধুসূদন রিকশাওয়ালা বলল, দাঁড়াও দেখি...।

হাততালি দিতে লাগল মধুসূদন, আছ নাকি ভুবনবাবু...।

কেউ কি আসে! দূরে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে খরবালা ও ভুবন মণ্ডল।